শওকত আলী

লেলিহান সাধ

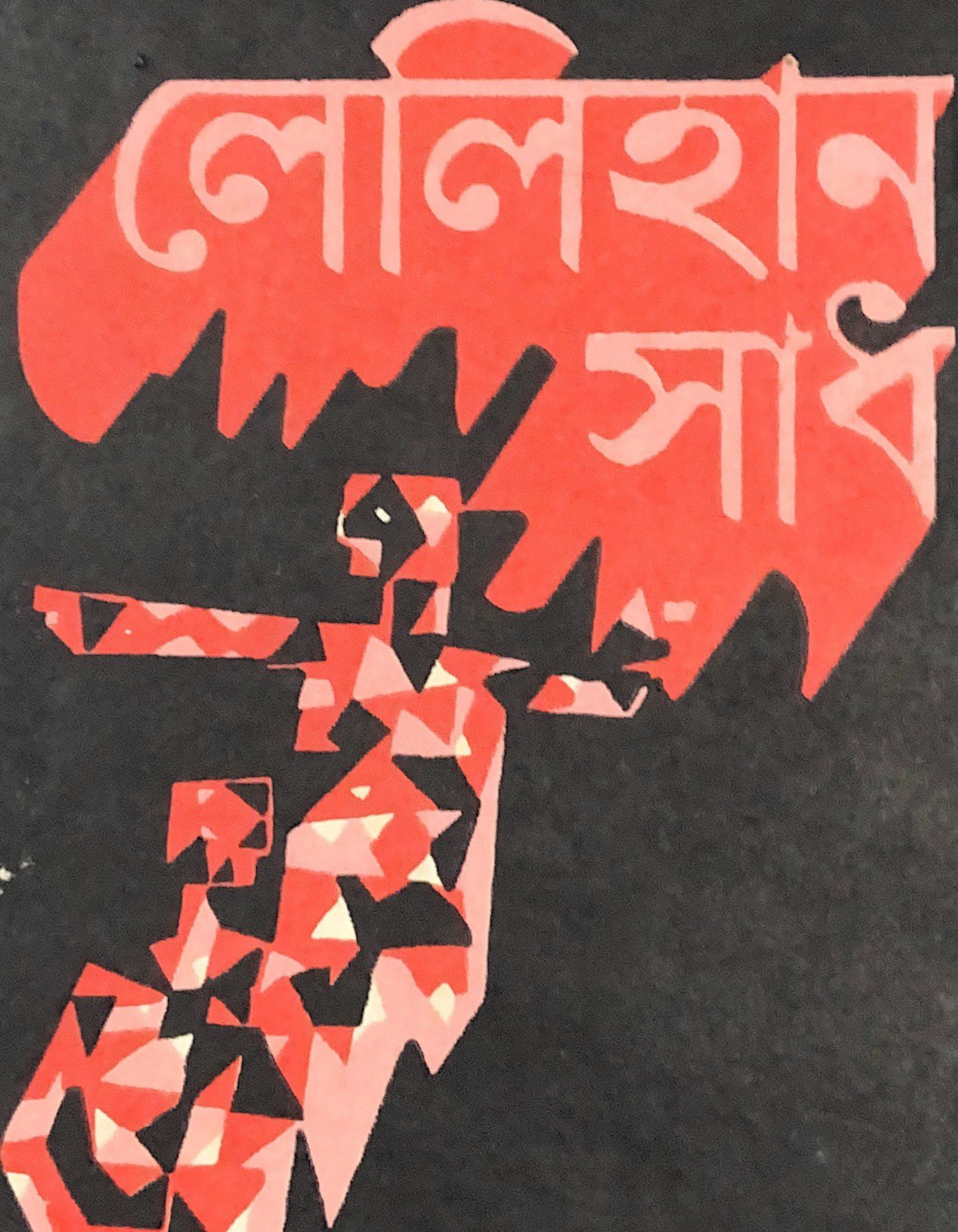

লেলিহান সাধ

শওকত আলী

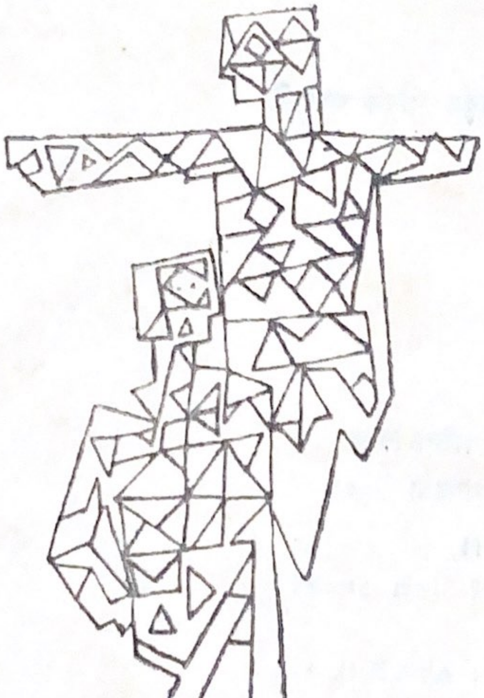

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৪

মুক্তধারা ৮৪২

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ-শিল্পী : আবুল বারক আল্‌ভী
মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
মূল্য : সাদা : পঁচিশ টাকা
নিউজপ্রিন্ট : পনরো টাকা

LELIHAN SADH
[A Collection of Short Stories]
By Showkat Ali
Cover Design : Abul Bark Alvi
Second Edition : July 1984
Publisher : C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka-1
Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 25·00
Newsprint : Taka 15·00

অজ্ঞাতবাসিনী মা-কে

রচনাকাল : আর মা কান্দে না ১৯৬৭ নবজাতক ১৯৬৮ লেলিহান সাধ ১৯৬৮ পুনর্বার বেয়নেট ১৯৭২ কোথায় আমার ভালোবাসা ১৯৭২ ভবনদী ১৯৭৪ নয়নতারা কোথায় রে ১৯৭৫ কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ ১৯৭৬

সূচী

আর মা কান্দে না ৯
নবজাতক ২০
লেলিহান সাধ ৩৫
ভবনদী ৫৩
নয়নতারা কোথায় রে ৬৭
পুনর্বার বেয়নেট ৮১
কোথায় আমার ভালোবাসা ৯৫
কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ ১০১

আর মা কান্দে না।

অন্ধকার চারদিকে থৈ থৈ করে। মনে হয় বাতাসে অন্ধকারটা পাক খাচ্ছে ফুলছে আর চারদিকে কেমন ছড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তরে দেখো, দক্ষিণে দেখো, আসমানে তাকাও—শুধু কালো। থেকে থেকে কালো মেঘের পিণ্ডগুলো এক দিক থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে আরেক দিকে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শরীর কাঁপে, কিন্তু জুড়ায় না। অন্ধকারের নীচে, উথাল পাথাল বাতাসের অনেক আড়ালে, বয়ে-আসা ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস যেখানে ছুঁতে পারে না, সেখানে কোথায় যেন আগুন জ্বলছে নিশিদিন। জ্বলছে শুধু। বাতাস মোচড় খায় ছুটতে ছুটতে, আসমান গোঁ গোঁ করে ওঠে রাগী জানোয়ারের মতো, তবু জ্বলে সেই নীচের কোথায়। ঠিক ধরা যায় না। তবু জ্বলে, নিশিদিন ধিকিধিকি জ্বলে।

কান্নার সঙ্গে, সাধের সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে—কেবলি জ্বলে।

রমজান আলী অসহ্য গলায় ডেকে বলে, মা, তুই আর কান্দিস না. তোর খোদার দোহাই লাগে, চুপ কর।

মা শোনে না। অন্ধকার বাতাসে মোচড় খেতে খেতে কাতরায়। বর্ষণের ঝাপটা ভাঙ্গা চালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর মা কান্দে। গলা ছেড়ে চিৎকার করে নয়, মুখ-বাঁধা জানোয়ার যেমন গোঙায়, তেমনি কাঁদতে থাকে।

রমজান আলীর সহ্য হয় না, তখন গালাগাল দিতে আরম্ভ করে। ক্ষেপে-ওঠা সন্ধেবেলার আসমানকে গাল দেয়। নিজের মায়ের দেহকে শোয়ায় কল্পিত পুরুষ মানুষের বিছানায় এবং শেষ পর্যন্ত চিৎকার করে বলে, তুই মরতে পারিস না বুড়ি...! মর তুই, মরে যা, আমি শান্তি পাই তাহলে।

কেউ শোনে না। বাতাসে দোল খাওয়া অন্ধকার না. ঘোলাটে আসমান না. আর মা'ও হয়তো শোনে না। তাই কান্দে। মনে হয় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেবলি কেঁদে যাচ্ছে। বিকেল থেকে চিৎকার করে গাল দিচ্ছে. ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু বুড়ি শোনে না। তাই রমজান আলীর মনে থেকে থেকে পালাবার কথাটা জেগে উঠছে এখন। ভাবছে, পালাবে এবার। বৃষ্টিটা থামলে হয়।

কিন্তু বৃষ্টি থামছে না। জেঠ মাসের আসমান, কিন্তু ছেনালী দেখো। কদিন আগে মানুষ আউশ ফেলতে পারছিলো না, যেন উপুড় করে আগুন ঢালতো তখন, আর আজ তিন দিন সমানে পানি ঢালছে।

একবার কান পাতলো, না বুড়ি আর কাঁদছে না। এবার তাহলে বমি শুরু হবে। মুখের লালায় শিথান ভিজে যাবে, ছিটছিটে রক্ত থাকবে সেই সঙ্গে। তার মানে, আরো ঝামেলা। রমজান আলী উঠে দাঁড়ালো, আর নয়, এবার পালাতেই হবে তাকে। মরুক বুড়ি। সব তো মরে সাফ হয়ে গেলো। বাপ, ভাই, হালের জোড়া গরু। দেখতে না দেখতেই দু বছরে সব সাফ হয়ে গেলো। বাঁচলো শুধু ঐ বুড়ি। বেঁচে থেকে পেটের ব্যারাম বাঁধালো। হাপি ডাক্তার বলে, পেটের ভেতরে ঘা হয়েছে। সেই ঘায়ের বিষে মা কান্দে। কিছু খেতে দিও তাহলেই বিষ থামবে।

আসলে সবটাই ফাঁকি, রমজান আলী বোঝে। বাপ মরে ফাঁকি দিলো, বাপ মরলে মহাজন আধির জমি ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলো। আর মায়ের ব্যারাম, এটাও ফাঁকি। আসলে বুড়ি খেতে চায়। পেটের ব্যারাম ট্যারাম কিছু নয়। কিছু জুটুক না জুটুক, খেতে দাও। বুড়ি সব সময় মুখ মেলে আছে। ইদিকে নিজের গেরস্থি ছেড়ে ছেলেকে যে অন্যের ক্ষেতে মজুরী করতে হচ্ছে, বৃষ্টির জন্যে যে নিড়ানির কাজ বন্ধ আছে, আর কাজ বন্ধ থাকলে যে মহাজন পয়সা দেয় না—সে সব বিচার নেই। কেবলি খেতে দাও। রমজান আলীর রাগ হতে লাগলো নতুন করে।

আর তখনই আবার শুনলো সেই কাতরানি। প্রথমটা আমল দিলো না। ভাবলো বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ার আগে শেষ কাতরানিটুকু দিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু একটু পরই বোঝা গেলো, বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বুড়ি কাঁদতে আরম্ভ করেছে। এবার গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ। কান্নাটা শুনতে শুনতে আর সহ্য হলো না। দরজার কাছে গিয়ে হিস হিস করে উঠলো, ফের যুদি কান্দিস বুড়ি, তা হইলে গলাত্ পাও চিপে মারে ফালামু। বুড়ি ঘোলাটে চোখে শুধু তাকিয়ে দেখলো, তারপর মুখ বুঁজলো। কিন্তু কান্নাটা বন্ধ হলো না। মুখ বোঁজা অসহ্য শব্দটা আরো বিচিত্র স্বরে, আরো গভীর হয়ে বেরুতে লাগলো।

রমজান আলীকে আবার দাওয়ায় এসে বসতে হয় তখন। জানে বুড়ির আজ সারারাত ধরে এই চিৎকারটা চলতে থাকবে। বড় জ্বালাচ্ছে বুড়ি। আহা যদি একবার পালিয়ে যেতে পারতো।

আজ বিকেল থেকেই পালাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে, কিন্তু যাবে কোথায়? রমজান আলী ভেবে পায় না। চৌধুরীর বৈঠকখানায় গানের আসর বসলে না হয় সেখানে একটা যাবার জায়গা থাকতো। কিন্তু সেও তো কে জানে কেন বন্ধ। ওদিকে তসির কসির দু ভাইকে পাওয়া যাবে কি না তারো ঠিক নেই। হয়তো বৃষ্টির দিনে যার যার বউ-এর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। সবারই সব কিছু আছে শুধু তারই নেই। হায়রে! মানুষের কপাল কী দেখো।

রমজান আলীর হঠাৎ মনে হলো, আওয়াজটা শুনলো যেন সে। তখন কান পাতলো ভালো করে। কিন্তু কোথায় হারমোনির আওয়াজ? মায়ের কাতর কান্নাটা সবকিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে।

সে এবার চিৎকার করে উঠলো, বুড়ি, চুপ করবি?

বুড়ি চুপ করলো না। উদ্বেল অসহ্য আর্তনাদটা কেমন চাপা পড়লো শুধু। রমজান আলী হাত বাড়িয়ে পরখ করলো, বৃষ্টির তেজ কমেছে কিনা। এখনো সমানে ঝরছে দেখে আবার ফিরে এসে বসলো দাওয়ায়। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তখন নানান কথা মনে পড়ে। একবার ভাবলো মা যদি না থাকতো, যদি একটা বোবা কান্না কানের কাছে দিনরাত শুনতে না হতো—তাহলে সে বেঁচে যেতো। একবার মনে হলো, ধুতুরার বীচি খাইয়ে দিলে কেমন হয়? ইস্কুল ঘরের পেছনে কয়টা ধুতুরার গাছ দেখেছে সে। কাঁটা কাঁটা ফল ধরে আছে। তার একটা ছিঁড়ে এনে পিষে রসটা মুখে তুলে দেবে তারপর পালাবে। সারারাত আসরে বসে গান শুনে সকালে এসে দেখবে, বুড়ি মরে পড়ে আছে।

কিন্তু মায়ের মরা মুখ কল্পনা করে তার খারাপ লাগলো। মরা মুখ দেখলে বিশ্রী লাগে তার। অনেক মরা দেখেছে সে। বাপ মরলো কাশতে কাশতে গলায় রক্ত তুলে। চোখ দুটো কালো গর্তে ঢোকা, মুখ মেলে ছিলো—শেষবারের মতো দম নিতে চেয়েছিলো বোধ হয়। আর ভাই-এর মরণ—নাঃ ভাবতেও খারাপ লাগে।

আজগুবি ভাবনাগুলো সরিয়ে একসময় কোথায় গিয়ে রাত কাটাবে তাই ভাবতে বসলো। দু রাত ধরে এই কাতরানি শুনছে, আর নয়। ওদিকে দেখো কলার পাতায় ভারী শব্দ করে বৃষ্টি ঝরছে। মায়ের গলা সোচ্চার হলো আবার। আর সেই সঙ্গে হঠাৎ শুনলো, চৌধুরী বাড়ী থেকে হারমোনির পোঁ পোঁ বাজনাটা ভেসে আসছে।

রমজান আলী তখন অস্থির হয়ে উঠলো, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই সে পালাবে। আর এক মুহূর্ত নয়। বাইরের দিকে নজর ফেরালো একবার।

আর তখনই দেখলো, মাঠের মাঝখান দিয়ে পাট ক্ষেতের আল ধরে লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে যাচ্ছে। কে যায়, কে বাহে?

কেউ সাড়া দিলো না। কলিমদ্দিনের বউ নিশ্চয়ই।

চৌধুরী বাড়ির দিকে রাস্তা ধরেছে। আগে অন্ধকারেই চলে যেতো, আড়ালে আড়ালে। কদিন আগে সাপের ছোবল খেয়ে মরলো মনোহরের মেয়েটা। সেই থেকে ভয় হয়েছে। বাতি ছাড়া পথ চলে না কলিমদ্দিনের বউ। মেয়েটার জানের বড় ভয়। বুড়ো মহাজনের ভারী পছন্দ কলিমদ্দিনের বউকে। শোনা যায় কলিমদ্দিনের বউ কাছে না থাকলে বুড়ো ঘুমিয়ে আরাম পায় না। রমজান আলীর হাসি পেলো, চৌধুরীর ঘরে যাচ্ছে, তবু ভয় দেখো। নিজের বেহাল অবস্থাতেও সাধ হলো ডেকে বলে, চৌধুরীর ঘরে যাচ্ছিস জানলে সাপ তো সাপ—সাপের বাপ পর্যন্ত গর্ত থেকে মাথা তুলতে সাহস পাবে না, মিছিমিছি বাতি নিয়ে যাওয়ার কি দরকার। ভাবলো, ডেকে বলে মজার কথাটা। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা অনেক দূরে চলে গেছে।

ওদিকে চিৎকার করে গান ধরেছে বিনোদলাল। মিহি গলায় বেহুলা সুন্দরীর গান গাইছে। ছোট চৌধুরীর শখ। গানবাজনার জন্যে মানুষটা পাগল। বৃষ্টি বাদলে কাজ কাম বন্ধ থাকলো তো ওদিকে চৌধুরীর বাড়িতে শুরু হয়ে গেলো গানের পালা। বর্ষা শেষ হতে না হতেই ছোট চৌধুরীর দল এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে গানের আসর বসাবে। আর কী গান সে সব! ছোট চৌধুরী 'ছুকরা' পোষে। বাপের নজর কলিমদ্দিন চোরের বউয়ের ওপর আর ছেলে অল্পবয়সী দুই ছোঁড়া বিনোদলাল আর শাজামালকে নিয়ে পাগল। ছোট চৌধুরী ইদিকে আবার গুণী মানুষ। নতুন নতুন বুদ্ধি খেলে মাথায়। বললো, লোহার বাসরে দুখের গান ক্যানে গাহিবে বেহুলা সুন্দরী? ফুর্তির গান চাই, রসের গান। গান বাঁধা হলো,

দিব পতিধন
এ সোনার যৈবন
পালঙ্কে আসিয়া বসো।

দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে আবার ফিরে এসে বসলো রমজান আলী। আসমানটা সত্যিই দুশমনি আরম্ভ করে দিয়েছে। দাওয়ায় বসে বসে তখন

গানের আসরের কথা ভাবতে বসলো। নিশ্চয়ই এতোক্ষণে জমজমাট আসর বসে গেছে। জ্বলে জ্বলে হ্যাজাক বাতি আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে, সাজ পরেছে বিনোদ লাল আর শাজামাল। চৌধুরীর কড়া হুকুম, বাইরের আসর হোক কি ঘরের, বিনোদসখি আর শাজামালের সাজ পরা চাই। নারকেলের জোড়-মালা বুকে বাঁধা হবে, ঝলমলে কাপড় জামা, রাশভর্তি চুল, মুখে রং, লাল টুকটুকে ঠোঁট—সব থাকা চাই। একেকবার গান শেষ হবে আর এসে এসে বসবে ছোট চৌধুরীর কোলে। ছোট চৌধুরী পিঠে হাত রেখে আদর করবে, নকল উঁচু বুকের ওপর সেপটিপিন দিয়ে পাঁচ টাকার নতুন নোট গেঁথে দেবে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে নকল বুকের ওপর হাত রাখতে চাইবে আর চারদিকে হুল্লোড় উঠতে থাকবে।

যেন স্বপ্নের ঝলমলে আসর। কেমন নেশা ধরানো জিনিষ। রমজান আলী আসরের মাঝখানে বসতে পারেনি কখনো। দোরের কাছ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। একবার শাজামাল তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লেগেছিলো। কাছ থেকেও শাজামালকে মনে হয়েছিলো পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে দেখা কোনো যুবতীর মতো। তার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হাত দুটোর ভেতরে রক্ত শিরশির করে উঠেছিলো।

নিশ্চয়ই সেই গানটা গাইছে এখন শাজামাল—সই করিস না গে ভুল, দিস না কাঁখো বুকের জোড়া ফুল। বেহুলার গলা জড়িয়ে ধরে, ঘুরে ঘুরে পাছার ঠমক তুলে নাচছে আর গাইছে। আহা, কী গান! কল্পনা করে রমজান আলীর বুকের ভেতরটা হা হা করে উঠলো। নিজের মনে গুন গুন করলো দুবার—সই করিস না গে ভুল...। নিজের গলায় বেসুরো লাগলে তখন আবার দুত্তোর বলে নিজেকে গাল দিয়ে উঠলো। না, আর পারা যায় না, বসে থাকতে অসহ্য লাগছে এখন।

ওদিকে কেমন জমজমাট আসর বসে গেছে, আর ইদিকে সে ঘর থেকে বাইরে বেরুতে পারছে না। রমজান আলীর নিজেরই ওপর রাগ হতে লাগলো। একখানা বাড়তি তহবন নেই তার। ভেজা কাপড়ে আসরে গেলে ঢুকতেই দেবে না ছোট চৌধুরী। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আবার পথে নামিয়ে দেবে বৃষ্টির মধ্যেই।

রমজান আরেকবার কান পাতলো, বৃষ্টির তেজটা কমছে কি না ঠাহর করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নাঃ, কোথায়! আসমানের ছেনালীর শেষ নাই বাহে। আবার বেড়েছে বৃষ্টির বেগ। হারমোনির বাজনাটাও শোনা যায় না।

বাজনা শোনা যায় না কিন্তু এদিকে কান্নাটা ঠিক শোনা যায়। ঘরের ভেতরে মা আবার কাঁদছে।

হ্যাঁ, মা কান্দে। কান্দন ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না বুড়ি। উথাল পাথাল তুফান বহুক, দেওয়ার পানিতে বান ভাসুক—মা তবু দেখো কান্দে। মা ধান ভানে না, মা রান্ধে না—মা বুড়ি খালি কান্দে। পৌষে নবানের ডালা সাজায় না বুড়ি, সবরাতের চেরাগ জ্বলায় না কখনো—খালি কান্দে। সাঞ্ঝের আন্ধার হোক, পোহাতের আলো হোক, দেওয়া হোক, খরা হোক—মা কান্দে।

হঠাৎ চোখের সামনে অন্ধকারেই দেখা গেলো পানিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে হেঁটে যাচ্ছে কারা। কে, কে যাছেন বাহে ?

কেউ উত্তর দেয় না। দিলেও শোনা যায় না। শোনা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় আউশের নতুন ক্ষেত পানিতে ডুবে গেলে ধান বরবাদ হয়ে যাবে সেই আশঙ্কায় আল কেটে দিতে যাচ্ছে দীনু বর্মন আর তমিজ মুন্সী। তার নিজের জমির আল কে কাটবে এখন ? হঠাৎ মনে পড়ে যায় রমজান আলীর। মহাজন জমিটা ছাড়িয়ে নিলো। চৌধুরীর পা জড়িয়ে ধরলে বলেছে, জমি আধি লিয়ে কি করবো এখুন কহ ? তার চাইতে—অন্য পরামর্শ দিয়েছে তখন ছোট চোধুরী। কানে কানে বলেছে, কলিমদ্দিনের সাকরেদী কর বরং।

কলিমদ্দিনের বউটাও কাছে ডেকে ঐ একই কথা বলেছে। বলেছে, জোয়ান মানুষ, কিষান খাটে কদিন চলাবো ? তার চাইতে হামার বাড়ির মানুষটার সঙ্গে যা, ভালো কামাই করবো। রমজান আলী কলিমদ্দিনের বউএর ভরাট বুক আর পুষ্ট দেহের ওপর নজর রেখেছে তখন। মেয়েমানুষটার কিন্তু সরম নাই, তাকে দেখতে দিয়েছে, চোখের কোণে তাকিয়ে হেসেছে। কিন্তু ঐপর্যন্তই, তার বেশী নয়! এক পা এগিয়েছে কি অমনি বলে উঠেছে—ব্যস ব্যস, আর বেশী আগাইলে মাহাজনের কানত উঠিবে ইকথা, হুঁ। কুঁজার চিত হয়ে শুতিবার সাধ তখুন নিক্‌লে যাবে একেবারে।

কথাটি বলবার সময় বুড়ো চৌধুরীর দেয়া কানের মাকড়ি জোড়া ঝিকমিক করে উঠেছিলো বিকেল বেলার রোদ লেগে।

রমজান আলী মনে মনে গালাগালি করতে করতে ফিরে এসেছে সেদিন। কলিমদ্দিন চোরের সাকরেদ হবার পরামর্শটা বাতিল করে দিয়েছে সহজেই।

হ্যাঁ, এবার বৃষ্টিটা থামলো বোধ হয়। রমজান আলী হারমোনিয়ামের আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেলো এবার। এখন নিশ্চয়ই চলে যেতে পারবে। মা কাঁদছে এখনো। তবে গলার স্বর মিয়ানো। একটু আগে বমি করছিলো, এখন চেঁচিয়ে কাঁদবার শক্তিটুকুও নেই। এবার শান্ত হয়ে পড়বে।

দাওয়া থেকে লাফিয়ে উঠোনে নামতেই কাতরানিটা শুনতে পেলো আবার। মা ঘুমোয়নি। কাতর কান্না শুনলো রমজান আলী. যাইস না বেটা, বাপ, যাইস না—মুই মরে যামু।

রমজান আলীর পা থমকে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত. তারপর ছোটে! নাঃ দুদিন ধরে একটানা কান্না শুনছে সে. আর না. এখন কাঁদুক বুড়ি যতো খুশি।

ভিজতে ভিজতে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে যখন পেঁৗছুলো তখন আসর জমে উঠেছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের ঠাণ্ডা কিন্তু ঘরের ভেতরে দেখো কেমন আরামের উম। হ্যাজাক জ্বলছে. রাজ্যের পোকা ঘিরে ধরেছে বাতি। শাজামাল সখির গান গাইছে ঘুরে ঘুরে—সই সয়া যুদি সায়া খুলে বাধা দিও না। সই, সয়া যুদি চুমা চাহে নিরাশ কৈরো না। আহা সায় যুদি-ই-ই—

রমজান আলী তখন নয়ন ভরে দেখছে। ভারী খুশি লাগছে তার। দুনিয়া ভুলে গেছে তখন সে। ঝলমলে পোশাকে শাজামালকে সত্যি সত্যি রসবতী যুবতীর মতো দেখাচ্ছে। বাঁয়া তবলা নিয়ে মেতে উঠেছে কিশোরীমোহন, বেলাত আলী হারমোনি বাজাচ্ছে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে।

রমজান আলী এক সময় দোর ঘেঁসে বসে পড়লো। বেহুলার নতুন গান শুনে মেতে উঠলো সেও। বাসর ঘরে লখিন্দর কেমন নাগর, বেহুলা কেমন যৌবন ভারে পীড়িতা যুবতী—তাই দেখছে। রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনলো, বিছানায় যাবার আগে এক এক করে পোশাক খুলে বেহুলার কেমন আমন্ত্রণ। এমন গান সে জীবনে শোনেনি। তার বিশ্বাস হলো, ছোট চৌধুরীর পালা এবার ভালো জমবে। এ পালার কাছে কোথায় লাগে পুরনো বেহুলার পালা।

আর এমনি জমজমাট সময়ে হঠাৎ হ্যাজাক বাতিটা নিভে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো বিশ্রী হুটোপুটি। এতোক্ষণ কেমন একটা ঝড় ধোঁয়াচ্ছিলো আসরের মধ্যে। বাতিটা নেভার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝড়টা যেন টালমাটাল হয়ে উঠলো।

অন্ধকারে ভীড়ের মধ্যে কোথায় শাজামাল চিৎকার করছে, ছাড়, ছাড়ে দে, দাদা গে! ছেলেটার বিপন্ন গলার স্বর শুনে অদ্ভুত উত্তেজনায় রমজান

আলীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে নিজেও এগিয়ে যাচ্ছিলো ঐ হুটোপুটির দিকে। শুনতে পেলো বিনোদলাল কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে অসহায় বাচচার মতো। রমজান আলীর কেমন ঘোর লেগে গেলো তখন। সেও চিৎকার করে উঠলো। কি বলছে খেয়াল নেই, নেশাগ্রস্ত মানুষের স্খলিত গলায় সে চিৎকার করে চললো। ধর শালীক, লিয়ে লে, আঃ মাহাজনের কোলাত বেড্ডী সুখ, না ? সে নিজে নয়, আরো যেন কে কে। কে যেন বলে উঠলো, বুঝ শালী, কেমন লাগে ! উৎক্ষিপ্ত, একাকার, উত্তপ্ত অন্ধকারটা যেন বিশাল একটা সাপ হয়ে পাক খাচ্ছে, মোচড় দিচ্ছে শরীরে, হিস হিস করে উঠছে তার লোভী নিঃশ্বাস। আর তখনই ছোট চৌধুরীর হুঙ্কার শোনা গেলো, ঘোড়ার চাবুকটা আন, লিয়ে আয় চাবুকটা।

তাই শুনে যে যেদিকে পারলো, পালালো।

রমজান আলী লাফিয়ে নামলো উঠোনে। তারপর আমতলা দিয়ে দে ছুট। তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে তখন। সঙ্গে আসছিলো লাল মোহাম্মদ। সে হেসে হেসে বললো, শালার হাতটা নরম কী রে! আর গালটা এক্কেবারে মাখনের লাখান, কুন' মায়া মানুষেরও অমন গাল হয় না।

একটু পর আবার মন্তব্য করলো, সেই কারণেই তো চৌধুরী মাহাজন অমন দেখনেঅলী বউ ফেলে গানের পালা বসায়। শালারা মরদ নহে, এক্কেবারে মায়ামানুষ।

রমজানের তখন দারুন কৌতূহল। অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুই কি করলো আঁ ? কী করলো তুই ?

লাল মোহাম্মদ পথ হাঁটে আর হাসে। বলে না কী করেছে। তার হাসিতে কেমন একটা তৃপ্তির ভাব গলে গলে পড়ছে। মনে হচ্ছে দাঁত দিয়ে কামড়ে খেয়ে এসেছে সে শাজামালকে।

বৃষ্টি নেই, হাওয়ার তেজ থেমে গেছে। কেবল থেকে থেকে পানি-ভেজা ভারী বাতাস অন্ধকারে ভর করে বয়ে আসছে। পানি চকচকে মাঠে ঘোলাটে আসমানের আভা ছড়ানো। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর রমজান আলী শুধায়, এখুন কুনঠে যাবো লাল দাদা ?

লাল মোহাম্মদ এখন আর হাসে না। কেমন বিষণ্ন গলায় কথা বলে, এখুন বাড়িত্ যামু। তারপর আবার অনিশ্চিত হয়ে ওঠে গলার স্বর। বলে, বাড়িটাও ভাল লাগে না বাহে, কুনঠে যে যামু! শালার রাইত পোহায় যায়, তাহো নিন্দ আসে না। সংসার হইল্ নি এখুনও, হামার মতোন মানষের ঘরই কি আর বাড়িই কি কহ?

লাল মোহাম্মদের গলার স্বর বদলে গেছে এখন। বলছে, শহরত গেনু, উঠিও ঐঠেও কুন' কাম নাই, ইদিক গাঁওতু পড়ে থাকিলে কাম জুটে না। কী যে হোবে মানুষের!

এখন আর কেউ হাসে না। এক সময় হঠাৎ লাল মোহাম্মদ শুধোয়, মাহাজনের গোলাত্ এখুনও ধান কতো দেখিছিস?

রমজান আলী শোনে। লাল মোহাম্মদ বলে যায়। কলিমদ্দিন চোরের সাকরেদ, কালো শুকনো মানুষটার দুচোখ জ্বল জ্বল করে। বলে, হাল নাই, গরু নাই, জমি নাই কেহ কিষাণ খাটায় না--তুই যাবো কুনঠে? তোর মতোন আজদাহা জোয়ান, তোকও কেহ ডাকে না। উদিক শালারা ধান জমা করিছে কতো দেখ্। কেহ চৈতের খরার দিন আগুন লাগায় না ক্যানে?

রমজান আলীর বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্ করে ওঠে। কল্পনায় দেখতে পায় চৌধুরীবাড়ি পুড়ছে। আসমান লাল হয়ে উঠেছে। ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে সারি সারি ধানের গোলা।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই, লাল মোহাম্মদ আর কথা বাড়ায় না। অন্য কথায় আসে। বলে, তোর কুন' কাজ কাম নাই, হয় না?

হ্যাঁ, মাথা নাড়ে রমজান আলী।

কলিমদ্দিনের সঙ্গে যাবো?

রমজান আলী চুপ করে থাকে। লাল মোহাম্মদ ফিস ফিস করে বলে, ওস্তাদের বউটার বড়া তেজ, উয়ার তেজ মারিবা পারবো?

বিমূঢ় রমজান আলী বুঝতে পারে না, কী বলতে চায় লাল মোহাম্মদ। শুধু বোকার মতো মুখোমুখি তাকিয়ে থাকে।

তোর মতোন জোয়ান দরকার, যাবো তুই?

রমজান আলীর সমস্ত শরীর ঝন ঝন করে বেজে উঠলো কথা শুনে। ঐখানেই শেষ নয়, লাল মোহাম্মদ মন্ত্র পড়ার মতো ক্রমাগত বলে চললো, চল তুই বাহে, ওস্তাদ নিজে ডাকিছে তোক। তার বহুটা আইজকাল শাসন মানে

না, ওস্তাদ ব্যারামী মানুষ, তার রাগ হয়, কিন্তু কিছু করিবা পারে না। চল বাহে, কুন চিন্তা নাই, চল তুই। তিনজনা মিলে কাম আর সমান বখরা হবে রোজগার, তুই চল একবার।

রমজান আলী শীর্ণ কালো লোকটার জলজলে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলেনা, ভাবেও না কিছু। ওদিকে অন্ধকারটা ঘোলাটে হয়ে আসছে। কলিমদ্দিনের বউ কি ঐ রাস্তায় আবার রাতের বেলা ফিরবে? চিন্তাগ্রস্ত।

স্মৃতি নয়, স্মৃতি তো জ্বালায় ভরা। বরং মেয়েমানুষের চিন্তায় অনেক আরাম। জমির কথা ভাববে না সে, জমি নিয়ে গেছে চৌধুরী মহাজন। মায়ের কথাও ভাববে না সে, মা যে নিশিদিন কান্দে। মেয়ে মানুষের কথা ভাবলে অনেক স্বস্তি। মুঠো মুঠো নরোম আর তাতানো মাংস হাত দিয়ে ছোঁবে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়বে আর সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করবে। বৃষ্টি নয়, বাতাস নয়, মাটি নয়, খরা নয়, দেওয়া নয়—শুধু মেয়েমানুষ, শুধু নরোম মাংস। মাটিও নরোম, রোপা দেবার সময় নরোম মাটিতে হাত ডোবাতে হয়। ঠাণ্ডা ভেজা মাটিতে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাত পা হেজে যেতো। এবার তা নয়, নরোম আর ফোলা ফোলা মাংসে হাত বসতে চাইবে না। কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই জীবন্ত মাংস পিণ্ডকে ধরে রাখতে হবে। তার উত্তাপে উত্তপ্ত করতে হবে নিজেকে। আর নিঙড়ে নিঙড়ে বেঁচে থাকবার রস বার করতে হবে।

রমজান আলী লাল মোহাম্মদকে বিদায় দিয়ে একাকী বাড়িমুখো চললো! বৃষ্টির পর খালের ধারে ধারে অসংখ্য পোকা ডাকছে এক সঙ্গে। দীনু বর্মনের বাগানে কলাপাতার ওপর নিমগাছের পাতা-ঝরা পানি পড়ছে ভোঁতা শব্দ করে। দূর থেকে নিজের বাড়িটাকে কেমন একাকী মনে হলো। যেন গাঁ থেকে তার বাড়টা আলাদা।

উঠোনের কাছে এসে আরেকবার দাঁড়ালো সে। বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে তার। হায় কী দিন! মা কান্দে, খালি কান্দে। পেটের ভেতরে, অনেক ভেতরে, দিনরাত যেখানে ধিকিধিকি আগুন দগদগে ঘা হয়ে জলছে, সেই আগুনের জ্বালা কখনো জুড়ায় না—তাই মা কান্দে।

তার কেমন আশা হলো, মায়ের এই কান্নাটা বন্ধ করতে পারবে সে। লাল মোহাম্মদের কথামতো যদি কলিমদ্দিনের সাকরেদী নেয় তাহলে মা আর অমন করে কাঁদবে না।

মনে মনে তখন মা'কে ডাকে সে। মা, আর তুই কান্দবো নাই। হায়, কী কান্দন মায়ের—আসমান জমিন রোদ দেওয়া সবকিছু পার হয়ে যায় মায়ের

এই কান্দন। জন্মজন্মোর সাধ, ফসল, গানের আসর, মেয়েমানুষ, লোভ সব কিছু ছেদ করে মায়ের চোখের পানি বহে যায়, হায় মায়ের কান্দন থামে না গো।

মনে মনে তখন সে শপথ নেয়, মায়ের কান্না সে এবার থামাবে, আর মাকে কাঁদতে দেবে না।

দাওয়ায় উঠে হঠাৎ সে কান পাতলো। সেই মুহূর্তে লাল মোহাম্মদ, ছোট চৌধুরী, শাজামাল, কলিমদ্দিনের বউ—সবার কথা ভুলে গেলো। আর একটু পরই তার গলার চিৎকার ঘরের অন্ধকার ফুঁড়ে বেরুলো—মা, তুই চুপ করে আছি ক্যানে, মা আর কান্দিস না ক্যানে, মা, কহ, তুই কান্দিস না ক্যানে! —ও মোর মা গে—।

নবজাতক

সন্ধেবেলা মহাজনের খামার বাড়ির উঠোনে আঁটি খুলে খুলে কাটা ধান ছড়াবার সময় কথাটা প্রথম মনে হয়েছিলো। ইদিকে তারপর ধান মাড়াই হয়েছে অনেক্ষণ। রাত বেড়েছে। উত্তরের সাতভাই তারা দেখো ওপরে উঠে গেছে অনেকখানি। শেষে মা খবরটা নিয়ে এলো—গাইটা বোধ হয় বিয়োবে।

বাপ খবরটা শুনেই মায়ের সঙ্গে চলে গেলো। যাবার সময় শুধু বলে গেলো, ব্যাটা পাতাহানটা ঝাড়ে ফালা। কথাটা বলার অপেক্ষা শুধু, তারপরই বুড়ো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলো। পেছন থেকে শোনা গেলো বাপ আল্লার নাম স্মরণ করছে।

বাপ চলে যাওয়াতে মস্তাজ আলীর এক সময় অসহায় বোধ হতে লাগলো। ধান মাড়াই প্রায় শেষ, এখন ভাগাভাগির সময়, বাপ না থাকলে কী হবে সে বলতে পারে না।

কারণ ওদিকে মহাজনের ছোট ছেলে হিসেবের খাতা নিয়ে আসবে এখুনি। ঐ লম্বা খেরো-বাঁধানো খাতাটাকে তার বড় ভয়। গুটি গুটি কালো আখরের হিসেবগুলো তার কাছে চিরকালই গোলমেলে। কি হিসেব যে দেখাবে মহাজনের ছেলে তা কারো বাপের সাধ্য নেই বোঝে। মণকে মণ ধান মাড়াই হবে, কিন্তু দেখো, ঘরে ফেরার সময় একটা বস্তা পুরো নিয়ে যাওয়া যাবে না। এবারের অবস্থা তো আরো খারাপ। এমনিতে খরায় আউশটা পুরো মারা গেলো : গত ভাদ্র আশ্বিনেও বাপ মহাজনের কাছারি ঘরের দাওয়ায় উবু হয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন। অবশেষে তিন মণ ধান কর্জা দিয়ে দয়া দেখিয়েছে দয়ালু মহাজন। সেই হিসেবও লেখা রয়েছে ঐ খাতায়। বাজারে তখন ধানের দর পচিশ, এখন কতো কে জানে—সেই টাকার হিসেবে এখন ধান দিয়ে ঋণ শুধতে হবে।

এমনিতে হিসেব সোজা—আধির আধা বখরা, একটা বাচচাও তা বোঝে। কিন্তু ঐ আধা বখরার পুরো চেহারাটা কোনোদিনই মস্তাজ আলী দেখতে পায় নি। কর্জা বাবদ যে কতোখানি কাটা পড়বে এখন সেই ভাবনা তার।

আর তাই বাপ চলে যাওয়াতে মন্তাজ আলীর ভীষণ অস্বস্তি লাগে। ইদিকে একসময় ছোট মহাজন ফিরে এসে দাওয়ায় চৌকির ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছে। হ্যারিকেনের আলোয় তার পান চিবুনো চোয়াল নড়তে দেখা যায়। লোকটা এখুনি আবার তার সঙ্গে মস্করা শুরু করে দেবে। অহেতুক খাতির জমাতে চাইবে, শহরের রগরগে গল্প শোনাবে আর মজা দেখবে। দেখতে চাইবে শহরের গল্প শুনে মূর্খ মন্তাজ আলী কী রকম বেসামাল হয়।

বাপ কাছে থাকলে এরকম অস্বস্তি লাগতো না তার। কিন্তু বাপকেই বা কেমন করে আটকে রাখে। ওদিকে গরুটা বোধ হয় সত্যিই বিয়োবে। আর এই আসন্ন ঘটনার সঙ্গে তার অনেক পুরনো হিসেব জড়ানো। বড় কষ্টের সেই সব হিসেব। গত বছর শাওন মাসের শেষে বলদ জোড়া মরে গেলো। খবর শুনে দয়ালু মহাজনের চেহারা কি তখন। ভাব দেখালো যেন মন্তাজ আলীর বাপকে জন্মে কখনো দেখে নি। নির্বিকার জানিয়ে দিলো—গরু মরেছে, ভাল কথা, জমিটা এবার ছেড়ে দাও, আমি অন্য আধিয়ার দেখি। তোমার গরু মরলো বলে আমার জমি আবাদ হবে না—এতো ঠিক নয়।

ওহ্ সে কি কাকুতি মিনতি বাপের। দিনের পর দিন হাতে পায়ে ধরা। অবশেষে দয়ালু মহাজন আবার দয়া দেখিয়েছে। শেষ সম্বল ভিটে মাটিসহ দু বিঘে জমি বাঁধা রেখে টাকা এনেছে বাপ। আর সেই টাকায় বুড়ো বলদ জোড়া কেনা। এমন বলদ, জোয়াল টানতে পারে না। মানুষের কপাল কি দেখো। একেক দিন মন্তাজ আলীকে সেই জোয়াল ঘাড়ে লাঙল টানতে হতো। কী দিন সে সব। দুর্ভাবনার পর দুর্ভাবনা, হতাশার পর হতাশা। একদিকে ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর চলে না, অন্য দিকে পেটের জ্বালায় দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসে। এমনি দিনের পর দিন। মন্তাজ আলীর একেক দিন মনে হতো, সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু গাইটাকে দেখতো সে চোখের সামনে। কিছুদিন আগেও ছোট বাছুর ছিলো—ভারী তেজী বকনা বাছুর। ধবধবে শাদা গলা উঁচু করে ঘাড় বাঁকিয়ে যখন তাকাতো, তখন মনে হতো—বুঝিবা যাত্রাদলের মহারানী।

ঐ বাছুর দেখতে দেখতে বড়সড় হয়ে উঠলো। তারপর যখন গাভীন হলো, তখন তার গা থেকে রোদও যেন পিছলে পড়ে যায়। সারা গায়ে ছিলছিলে মসৃন চেকনাই। গরুর ঐ চেহারা দেখেই সাহস ফিরে আসতো মনে। আশা জাগতো, হয়তো ঐ গর্ভ থেকে পুরুষ বাছুরের জন্ম হবে। বোঝো, সেই হিসেব,

সেই সাহস আর সেই আশার ঘটনাটিই আসন্ন হয়ে উঠেছে। বাঁপকে কোন বিচারে সে আটকে রাখে।

মস্তাজ আলী চিন্তা ভাবনা ঝেড়ে ফেলে কূলো ভর্তি ধান মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো মাটিতে তারপর বাতাস দিতে লাগলো কূলো হাঁকিয়ে। উড়ে যাক শাঁসহীন নিস্ফলা খোসার আবর্জনা। ধান বেরিয়ে আসুক—খুদে খুদে, শক্ত আর দানাদার। হঁ্যা, বেরিয়ে আসুক যতো তাড়াতাড়ি হয়। মস্তাজ আলী হঠাৎ ভারী উদ্যমী হয়ে উঠলো কাজে।

ছোট মহাজনের কিন্তু তাড়া নেই। সে আয়েস করে গল্প জমাতে চেষ্টা করে। খেই ধরে আবার সেই পুরনো গল্পের। ডেকে বলে, মস্তাজ তুই তো গেলো নাই ইবার মেলাত্।

সেই মেলার গল্প। সেই আলোকোজ্জ্বল রাত্রির বর্ণনা। বলে, সার্কেস পার্টির তিনটা মায়ামানুষ যা ছিল না। আহ্ হা. দেখিলে মন কহে খালি দেখতে থাক। গতরত্ একনা কাপড়া নাই বাহে—

ছোট মহাজনের ঐ মেয়ে মানুষের গল্প যেন ফুরোতে চায় না। হাসেনা বেগমের গল্প এসে যায়। হাসেনা বেগমের শরীরের বর্ণনা করতে করতে উত্তেজনায় ছোট মহাজন উঃ রে, বলে বিচিত্র গলায় চিৎকার করে উঠে।

ছোট মহাজনের এই রকম গল্প কতো যে আছে আল্লাহ জানে। মস্তাজ আলীকে এক সময় কান পাততে হয়। তখন বউকে নিয়ে রাত্রি যাপনের কথা মনে পড়ে যায়। আর সেই মুহূর্তে একেক সময় মনে হয়—সেই ভালো, ছোট মহাজনের সঙ্গেই সে একদিন চলে যাবে।

মেয়েমানুষের কথাটা মনে আসে। কিন্তু ঐ ক্ষণিকের জন্যেই। কারণ ঐ মহাজনের খাতা। অনেক দেখেছে সে। ফূর্তির হিসেব তো লেখা হবে ঐ খাতার মধ্যেই। টাকার কি অভাব আছে? টাকা নাও, কে আপত্তি করেছে? তবে সুদিনের দিন বাপু ধান দিয়ে শোধ করে দিও।

সেও ঐ একই মহাজনী হিসেব। সুদ লাগবে না। সব সময়ে সুদ খাওয়া কি আর ভালো। বড় মহাজন হজ্জ করে এসেছেন, নেকদার পয়বন্দ মানুষ—হুঁ হুঁ বাপ, পুলসেরাতের সেই পুল—চুলের সাঁকো, ক্ষুরের ধার, সেটা তো পেরুতে হবে।

মস্তাজ সিগারেট খাবো? গল্প থামিয়ে ছোট মহাজন এক সময়ে ডাকে।

মন্তাজ আলী তখন কূলোর বাতাস হাঁকানো থামিয়ে এগিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে সিগ্রেট নিয়ে দেশলাই জ্বেলে সিগ্রেট ধরায়। তার পর চারদিকে ছড়ানো খড়ের ওপর বসে বসে ধোঁয়া ছাড়ে। আর সেই সময় হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। আর তখন জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মাহাজন, ধানের দরটা কি ইবার ?

ছোট মহাজন ঈষৎ অবাক হয়। আধিয়ারের নির্বুদ্ধিতার কথা শুনে কেমন একটু খানি হাসিও পায়। শুধায়, ক্যানে বাহে, ধানের দর শুনে কি দরকার, কারবার ধরবো নাকি ?

না না, মন্তাজ আলী ভারী বিব্রত বোধ করে ছোট মহাজনের প্রশ্নে। বলে, না মাহাজন—কারবার কি আর হামার কাম।

তাহলে শুনে কি লাভ তোর ? ধর, এখুন ষোল টাকা, দু তিন হাট বাদে বিশ টাকাও হয়ে যাব্ব পারে—ধর বিশ টাকাই হইল্—তাতেই বা কি, তুই বেচিবো না কিনবো ?

মন্তাজ আলী কথা বলে না। ছোট মহাজনের সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছে নেই তার। শুধু হিসেব করে তখন। কিন্তু হিসেব গুলিয়ে যায় তার। তিন মণ ধান নিয়ে ছিলো বাপ সেই ভাদ্রে—তার মানে তিন কুড়ি পনেরো টাকা। কিন্তু ঐ টাকায় এখন কত মণ ধান পাওয়া যাবে—সেই হিসেবটা তার মাথায় আসে না।

ছোট মহাজন তখন ভিন্ন প্রসংগে কথা বলে চলেছে। লাহিড়ী হাটের ঝাড়ুদার বিপিন দাসের মেয়ে কনকবালার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিলো সেই বর্ণনা করছে। মাঝখানে বেমক্কা জিজ্ঞেস করে বসলো মন্তাজ আলী, আচ্ছা মাহাজন তা হইলে হামার কর্জটা শোধ করিতে কয় মণ ধান লাগিবে ?

ছোট মহাজন প্রশ্ন শুনে অপ্রস্তুত হয়। সে বলছে কোন কথা আর এই মূর্খ কিষাণ কোন চিন্তায় পাগল। ঈষৎ রাগ হয় তখন। বলে, তোর কি জ্ঞান বুদ্ধি কুনোদিন হোবে নাই মন্তাজ ? কুন কথাত্ তুই কুন কথা আনলো। তোর সঙ্গে যে শালা কথা কহে সে পাগল, বুঝলো ? লেউঠ্। কামটা শেষ কর, রাত হছে।

ধমক খেয়ে মন্তাজ আলী উঠে আসে। কাজে মন দেয়। আবার সেই দুহাতে কূলো ভর্তি ধান ওপর থেকে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলা, আবার কূলোর বাতাসে উড়িয়ে দেয়া খড় কুটো আর নির্বীজ পাতাহান। খসখসে ভারী ধান দু হাতে নাড়তে কেমন অদ্ভুত লাগে তার।

ধান ঝাড়তে ঝাড়তে একসময় মন্তাজ আলার কেমন মনে হয় ধানগুলো তার নিজের। তখন মহাজন কিম্বা মহাজনের খামার বাড়ি, সিগ্রেটের মাথায় আগুনের লাল বিন্দু—সব মুছে যায় চোখের সামনে থেকে নানান ছবি

জড়াজড়ি করে একের পর এক ভাসতে থাকে চোখের সামনে। দেখো, জমিতে সে নিজে লাঙল চালিয়েছে, নিজের হাতে বীজ ফেলেছে। রোপা দেবার সময় কোমর টাটিয়ে উঠতো। আহ্ কী কষ্ট তখন। ওদিকে আবার আসমান কালো হয়ে আসতো। বৃষ্টি নামতো দমকে দমকে—কষ্টের আর শেষ নাই। তারপর ডান হাতে কাস্তের পোঁচ মারো, গোছাশুদ্ধ ধান উঠে আসছে বাঁ হাতের মুঠোয়। বয়ে আনতে হচ্ছে বাঁকে করে—শীতের দিনেও ঘাম ঝরছে দেখো গা বেয়ে। ধান বইতে বইতে ঘাড়ে ঘাটা পড়ে গেলো। ঘাড়ের কাছটা শক্ত হয়ে আছে এখনো। আহ্ সে বড় কষ্ট বাহে, ধানের কথা আর কহেন না। ধান বড় কষ্টের জিনিস। মন্তাজ আলী ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে কেমন স্বগতোক্তি করতে থাকে। তারপর হঠাৎ ডাকে, মাহাজন।

কি বাহে, ছোট মহাজনের ঝিমুনি আসছিলো। ডাক শুনে সাড়া দিয়ে সজাগ হয়ে উঠে বসলো। শুধালো, কি হইল্ তোর?

মন্তাজ আলীর হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। কেন যে মনে পড়লো সে বলতে পারবে না, কিন্তু মনে পড়লো। সেই কষ্টের স্মৃতিচারণার ভেতরই সম্ভবতঃ লুকিয়েছিলো কোথাও কথাটা। হঠাৎ একসময় যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এলো।

মন্তাজ আলীকে ছোট মহাজন দেখলো অন্ধকারে কেমন ভূতের মতো এগিয়ে আসছে। ডাকলো, কি বাহে মন্তাজ, কি হইছে?

আচ্ছা মাহাজন, মন্তাজ তখন দাঁড়ালো, তেভাগার কথা জানেন তুমরা? ঐ যে ধান কাটা লিয়ে গোলমাল, জানেন তুমরা? ঐ বছরও কি ধান কর্জের এই নিয়ম ছিল?

নির্বোধ আধিয়ারের কথা শুনে ছোট মহাজন এবার হাসে না। কে জানে, হয়তো ঈষৎ বিরক্ত হয়। বলে, না বাহে তেভাগা না কুন্ ভাগা উসবের খবর মোর জানা নাই। এখুন জলদি ধান মাপার ব্যবস্থা কর।

একটু থেমে আবার বলে, আচ্ছা মন্তাজ, তোর কি কুনো দিন হুঁশজ্ঞান হবে নি—কুন্ পুরানা কালের কথা, উসব শুনে তোর কি লাভ কহ? উসব হাঙ্গাম হুজ্জতের কথা কি ভাল?

ছোট মহাজন কথা বলতে বলতে কম্বলের ভেতরে পা লম্বা করে। মন্তাজ আলীর উদ্ভট কথা শুনে রাগ হয়। কোথায় কাজ শেষ করে ঘরে গিয়ে শোবে—তা-নয়, হারামজ'দা গপ্পো জুড়তে চায়।

ছোট মহাজন সিগ্রেট ধরায় একটা। ঠোঁট থেকে সিগ্রেট না সরিয়েই আদেশ করে, বাদ দে উসব, ধানটা ইবার মাপ, রাত হছে।

হ্যাঁ, রাত হচ্ছে। মন্তাজ আলীও দেখতে পাচ্ছে রাত বাড়ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে উত্তর থেকে। টাঙনের ওপরকার সাঁকোটাকে এখন অতিকায় বৃশ্চিকের মতো দেখতে লাগছে। ঐ সাঁকোর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মন্তাজ আলীর বহুবার শোনা সেই পুরনো কাহিনী মনে পড়ে যায়। কাহিনী নয়, বলা যায় স্বপ্ন। কবে যেন আধিয়ার আর কিষাণেরা মহাজনের ঘরে ধান তোলেনি। মহাজনের ধান বাঁচাতে পুলিশ আসে শহর থেকে। বন্দুক লাঠি আর হাতকড়া নিয়ে গ্রামকে গ্রাম কিষাণদের ওপর হামলা চালায়।

হায় হায় বাপ উকথা কহিস না। কেহ শুনিলে ধরে লিয়ে যাবে। ভাতারখাকির কান্দরত্ কিষাণ আধিয়ারের সভা হইল্। সভার উপর গুলি চলিল্। আর ধান গাছের গোড়াত্ অক্ত জমাট হয়ে থাকিল্ কাদ'র মতোন। ধানের গোড়া শুকাল, অক্তও শুকাল—সান্তালের অক্ত, পলিয়ার অক্ত, মসলমানের অক্ত! ওহ্ সে কতো অক্ত বাহে—আর শুনিস না বাপ, উকথা আর শুনিবা চাহিস না।

এসবই অনেক আগে শোনা। আজ মহাজনের খামার-বাড়িতে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই পুরনো কথা আবার মনে পড়লো। মনোহর বর্মন ঐ কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলতো। বুড়োর মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুতো না। কিন্তু ঐটুকু যা বেরিয়ে যেতো তা-ই মন্তাজ আলীর বুকের ভেতরে থেকে থেকে ঘা দিয়ে ফিরতো। আহা, অনেকদিন লোকটা ইদিকে আর আসে না।

ছড়ানো ধানগুলো একজায়গায় জড়ো করতে করতে মনোহর দাসের কথাগুলো ঘুরে ফিরে মনে পড়তে লাগলো মন্তাজ আলীর। বুড়োর কতো কথা। এখনো মনে আছে সব। কতো ঘটনা! সব স্মৃতিতে উজ্জ্বল। আব্বাস আলী কী জোয়ান মরদ, পুলিশের হাত থেকে কেমন দিব্যি বন্দুক কেড়ে নিলো! আর টুরি মাঝিন, গুপীনাথ সাঁওতালের যুবতী বউ, তার কথা শোনো নি? পুলিশের মুখের ওপর ঝাড়ু মেরে বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলো—হাঁ বাহে, শুনেন নাই সে কথা?

মনোহর দাস নয়, সামনের অন্ধকারটাই যেন কথা বলে চলেছে। মন্তাজ আলী ঘুরে দাঁড়ালো একবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ছোট মহাজনের

আধশোয়া আবছা ভঙ্গীটার দিকে আর চকিতে একটা বাসনা মনের ভিতরে চমকে উঠলো : আহা ঐরকম ঘটনা যদি আবার ঘটতো !

আর ঐ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ মনে হলো কী যেন শুনতে পাচ্ছে সে। যা শোনার জন্যে মনে মনে এতোকাল ধরে অপেক্ষা করে ছিলো তাই যেন শোনা যাচ্ছে। কান পাতলো সে আর ঠিক শুনলো ভারী শব্দের কাতর আর্তনাদটা অন্ধকারের ওপার থেকে কেঁপে কেঁপে চলে আসছে। ডাকটা কেমন অস্থির করে দিলো তাকে। মহাজনকে ডেকে বললো, ইবার তাহলে বাপক ডাকি মাহাজন ?

রাস্তাটা অন্ধকার। তিনটে প্রকাণ্ড বটগাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আসমানের নীচে গাঢ় অন্ধকার জমিয়ে রেখেছে। আর সেই আদিম অন্ধকারের নীচে কালীর থান। খড়ো কুঁড়ে ঘরে কালীমূর্তি জিভ বার করে ভয়াবহ দাঁড়িয়ে আছে। গা ছম ছম করে রাস্তাটুকু হাঁটলে। ঐটুকু রাস্তা পেরুলেই চুনেদের পাড়া। লাল লাল কূপীর আলো দেখা যাচ্ছে—ঝিনুক গুগলি পোড়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

হাওয়া বইছে আরো জোরে। আকাশ কালো কাচের মতো ঝক ঝক করছে। মাথার ওপরকার সাতভায়া তারা চক্রাকারে ঘুরে এসেছে।

কলাপাতার ওপর শিশির ঝরার শব্দ হয়। সরকারী রাস্তার ওপারে যেখানে শীতের সাঁকো উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে কুয়াশা এখন ঘন। একেক সময় মনে হচ্ছে কুয়াশার একটা পর্দা যেন হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। ঠিক বোঝা যায় না, মনে হয়, বেলুনের মতো ফুলে উঠবে এক্ষুনি। এক্ষুনি নদী, আসমান, বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা, খামার-বাড়ির সার সার ধানের পুঞ্জ—সব কিছু কুয়াশার ভারী চাদরে ঢাকা পড়বে।

বাবা! দূর থেকেই মন্তাজ আলী ডাকলো।

জবাব আসে না। শুধু দেখা যায় লণ্ঠনের লাল আলো শূন্যে ওপরে দুলে উঠলো একবার। হ্যাঁ, বাপ তাকে পথ দেখাচ্ছে। বাপের মুখে কথা নেই।

মন্তাজ আলী বাড়ীর উঠোনে পৌঁছে লণ্ঠনের আলোয় বাপের মুখ দেখতে চেষ্টা করলো। আবছা আলোয় কিছু বোঝা যায় না। বাপ বুঝিবা অন্ধকার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বাপের পাশে মা দাঁড়িয়ে। মাথার কাপড় খসে গেছে। চোখের আঁধারে কেমন বিবর্ণ আর কঠিন স্তব্ধতা।

মন্তাজ আলী ডাকলো, বাবা জলদি চল, ছোট মাহাজন আর থাকিবা চাহে না!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই গরুটা আর্তনাদ করে উঠলো। ঐ আর্তনাদে বুকের ভেতরটা কেঁপে গেলো যেন। কেমন গভীর ভারী অথচ আমৃত্যু আজন্ম প্রোথিত একটা যন্ত্রনা নাড়া খেয়ে উঠলো ঐ শব্দের সঙ্গে। মন্তাজ আলী দেখলো, গোয়ালের দরজার কাছে গরুটা হঠাৎ গলা টান টান করে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। শুয়ে পড়ে পেছনের এক পা তুলে আবার একটা দীর্ঘ আর্তনাদ বার করলো গলা দিয়ে। প্রকাণ্ড ভারী এবং গভীর ঐ আর্তনাদের শব্দ ঢাকের আওয়াজের মতো আরেকবার বুকের ভেতরে গিয়ে ঘা মারলো।

মন্তাজ আলী লণ্ঠন হাতে এগিয়ে যায় তখন। গরুর গায়ের লোমগুলো এবার পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল পেট একপাশে উঁচু হয়ে উঠেছে। ল্যাজের নীচটা অস্বাভাবিক রকম ফোলা। কালো নরম আর মাংসল সেই অংশ থেকে পিচ্ছিল স্রাব গড়াচ্ছে। আরো নীচে গোলাপী দুধের ওলান স্ফীত। দুধের বাঁট যেন অতিকায় কিষাণ বাচ্চার ফোলা ফোলা পয়মন্ত হাতের আঙ্গুল। বাতির আলোয় গরুর চোখ দুটো চক চক করতে লাগলো। গরুটা কান ঝাড়লো একবার, একবার ল্যাজ দিয়ে পিঠের ওপরটা ঝাড়লো, তারপর আবার শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

গরুটা দ্বিতীয়বার চিৎকার করে শুয়ে পড়লে মা ছুটে এলো, ছেলের হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে ঝুঁকে পড়লো—আর দেখলো সবাই, মা বাবা ছেলে—সবাই ঠাহর করে দেখলো সেই পিচ্ছিল, মাংসল, স্রাব-গড়ানো নবজন্মের সিংহদ্বারের দিকে। মন্তাজ আলীর চোখ ফেরে না। দেখছে সে, স্রোত বয়ে-যাওয়া তরল একতাল কালো আর লালচে পিচ্ছিল মাংসস্তূপ কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আহারে! খোদা মাবুদ, আসান কর খোদা। মা অস্ফুট মিনতি জানায়।

বাপের ভ্রূ কুঁচকে আসে।

আর তখুনি আবার গরুটা পা ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠলো—ডো আঁ আঁ।

গরুটার নিম্নাঙ্গের দিকে মন্তাজ আলীর চোখ বারবার ফিরে আসে। একদা উথলানো মাংস টলমল করতো। যেদিন দড়ি ছিঁড়ে ষাঁড়ের কাছে পালালো, সেদিন মন্তাজ আলীর চোখ বারবার গরুটার চামড়ার উপরকার নিটোল মসৃণতা, সগর্ব ঘাড় আর উথলানো মাংসল নিম্নাঙ্গ দেখে মেয়েমানুষের তীব্র অভাব বোধ করেছিলো। কিন্তু এখন, ঐ নিম্নাঙ্গের দিকে সে পরম আশার চোখে তাকায়।

বলশালী ষাঁড় যে অতিকায় বাচ্চার জন্ম দিয়েছে গরুটার গর্ভে, মন্তাজ আলী দেখতে চায় তার বাইরে বেরুতে আর কতো দেরী।

একসময় গরুটা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো। মাথা নীচু করে খড় তুলে নিলো মুখে। মনে হলো ব্যথার দমকটা বুঝিবা থামলো।

চল ব্যাটা হামরা যাই ইবার, বুড়ো হাসন আলী শান্ত গরুর দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব করে। বলে, চল ধানের হিসাবটা শেষ করি।

বাপকে চলে যেতে উদ্যত দেখে মা ফিরে তাকায়। মা ভয় পায় বুঝি বা। বলে, মন্তাজ তুই থাক বাপ, মোর ডর করে।

মার চোখে আলো চমকায় না। শুধু মনে হয় মায়ের ঘোলাটে চোখে বোবা মমতা উথাল পাথাল করে যাচ্ছে।

ইদিক হাওয়া জোর দিয়েছে আবার। হাসন আলী বুড়ো ঠাণ্ডায় কাঁপছে। শরীরের একেবারে ভিতর থেকে কেউ যেন তাকে ধরে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে দিলো। জাড় কি রে! দাঁতে দাঁতে শব্দ বাজিয়ে বুড়ো ছেলেকে বললো, তুই বরং থাক মন্তাজ, মুই যাউ।

মন্তাজ আলী দেখলো হাওয়া এখন সাঁকোর ওপরকার পুঞ্জিভূত কুয়াশা চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। নদী আর সাঁকো, সাঁকো আর মাঠ, সব একাকার। ওদিকে আর দৃষ্টি চলে না। হাওয়ার তেজ ক্রমেই বাড়ছে, কমবার কোন লক্ষণ নেই। মন্তাজ আলী বাপকে বসিয়ে রেখে গোয়াল ঘরের খড়কুটো এনে আগুন জাললো। বাপ মা হাত মেলে ধরলো সেই আগুনের উত্তাপের দিকে। মায়ের ভাঙা তোবড়ানো কালো মুখে লাল আগুনের প্রতিফলন নাচতে লাগলো।

বা', মন্তাজ কিছুক্ষণ পর বাপকে ডাকে।

হঁা, হাসন আলী ঘুম থেকে জাগলো যেন। আলো আর উত্তাপে ঘুম পাচ্ছে বুড়োর।

যাবো নাই, মাহাজনের হিসাবটা—

হঁা যামু। হাসন আলী চারদিকে তাকিয়ে দেখে একবার। তারপর বলে, আরে হিসাব তো সোজা, তখুন ধানের দরে টাকা দিছে, এখুন টাকার দরে ধান লিবে।

বাপের কথা শুনে মন্তাজ আলী চুপ করে থাকে। ঐ হিসাবটাই তো সে বোঝে না। যদি বুঝতো তাহলে বাপের কাছে ছুটে আসবার দরকার ছিলো

না। কর্জ নেয়ার সময় তিন মণ আর শুধবার সময়ে পাঁচ মণ—এ কেমন হিসাব? সে বাপকে ডাকে, তুই চল ।

আর ঠিক সেই সময়ে, যখন হাসন আলী উঠতে যাবে তখুনি গরুটা পা ছুঁড়ে ভীষণ চিৎকার করে উঠলো।

ইঃ শালার গরু তো জ্বলাবে—হাসন আলী গরুর ছটফটানি দেখে বিরক্তি বোধ করে। তারপর পা বাড়ায়, মুই যাউ বেটা, তুই থাক, দেখিস গরুটাক্।

বাপ চলে যাবার পর গরুটার অস্থিরতা বেড়ে যেতে থাকে। একবার উঠে দাঁড়ায়, আবার গড়িয়ে পড়ে কাত হয়ে। একেক বার পেছনের পা তুলে দম বন্ধ করে জোরে কোঁথ দেয়—আবার কী হয় কে জানে, সেই ভয়ানক আর্তনাদ করে ওঠে।

মা আল্লার নাম করে, মুশকিল আসান কর খোদা, ইয়া মাবুদ, রহম কর।

মন্তাজ আলী মায়ের দিকে তাকায়। মা একহাতে লণ্ঠন তুলে তাকিয়ে আছে প্রসব পথের দিকে। তরল লালচে স্রাব বেরুচ্ছে দমকে দমকে। মায়ের মুখে অস্থির যন্ত্রণার আঁকিবুঁকি। চোয়াল বেরুনো ভাঙাচোরা মুখের ঠোঁটে মন্ত্রের মতো অস্ফুট উচ্চারণ বেরুচ্ছে। আল্লা খালাস কর মাবুদ, আল্লা আমিন, রহম কর খোদা।

মন্তাজ আলীর মনে হলো, গরুটার যন্ত্রণা যেন মায়ের স্মৃতি মথিত করে ফিরছে। মায়ের দুই উরুর মাঝখানে অতি পুরনো একটা যন্ত্রণা যেন পাক খেয়ে উঠছে থেকে থেকে। অনেক সাধের, অনেক স্বপ্নের ভেতর থেকে সম্ভবতঃ যন্ত্রনাটার জন্ম হয়েছিলো। আর তাই দেখো, মায়ের চোখেও পানি।

মন্তাজ আলী গরুটার দিকেও তাকিয়ে দেখলো, তার দুচোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। মানুষ এবং জানোয়ারের এইরকম একটা সম্মিলিত যন্ত্রণা দেখে তার ভারী খারাপ লাগে। কী করবে ভেবে পায় না। ইদিক ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে থেকে ঝাপটা মারছে, আসমান তারা কিছুই দেখা যায় না—এমনি কুয়াশা। সে তখন ভাবে বাপকে ডাকলে হয়তো বা সুরাহা হবে একটা। বলে, মা, বাবাক্ ডাকিম্।

মা শুনতে পায় না ছেলের কথা। মা তখন গরুটার গলার কাছে হাত বুলিয়ে ডাকছে, আর কনে মা, আর কনে সহ্য কর।

পোষা জানোয়ার নয়। যেন আত্মজা মেয়ে। মা মিনতি করছে গরুটার দিকে তাকিয়ে। পেছনের প্রসব পথ এখন বিশাল আকৃতি নিয়েছে। কেমন

অস্বাভাবিক লাগছে দেখে। মনে হচ্ছে গরুটা আর বাঁচবে না। এবার বুক ফেটে দম বেরিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

মা ভাঙ্গা গলায় ডাকে তখন, যা তো বাপ, তোর বাপক্ ডাক—একটা তাবিজ আনিবা কহিস।

মন্তাজ আলীর তখন অসহ্য লাগছিলো। ভারী খারাপ লাগছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখতে। সে মায়ের কথা শোনা মাত্র ছুটলো।

তখন তার স্মৃতি স্বপ্ন জ্বালা এবং ক্রোধ—সব কিছু এলোমেলো। চারদিকের কুয়াশাভরা অন্ধকারটাও যেন ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। ধানের হিসেব, গরুর বাচচা হবার খুশির খবর, ছোট মহাজনের কথা—কোনো কিছু এখন আর স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না সে!

খামার বাড়ীর উঠোনে দাঁড়াতেই বাপ ছুটে এলো, কি খবর? বাচচা হইছে?

না দেরী হবে, তোক মা ডাকাছে।

হাসন আলী ধান মাপবার কাঠা আর স্তূপীকৃত ধান দেখিয়ে বলে, হিসাব শেষ—ইবার তুই ধানটা মাপে ফালা মুই যাউঁ।

শুধু ঐ কটি কথা—তারপর উদ্বিগ্ন বাপ কুয়াশা আর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। মহাজন ডাকলো তখন, লে ভাই মন্তাজ, জলদি লে, রাত হছে। দশ মণ ধান হইছে, পাঁচ মণ একদিক রাখ আর হামার পাঁচ মণ ইদিক ফালা।

মন্তাজ আলী তখনও বিমূঢ়। একটা দশ সেরী কাঠা নিয়ে মাপতে শুরু করলো—রবে রব, দুবে দুই, দুবে দুই, তিনে তিন।

দুদিকে সমান দুটো ধানের স্তূপ হয়ে গেলে ছোট মহাজন ডাকে, মন্তাজ, হিসাবটা বুঝলো তো!

মন্তাজ শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আহ্ হা, মহাবিরক্ত হয় তখন ছোট মহাজন। বলে, আরে গাধা, সহজ হিসাবটা তোর মাথাত্ ঢুকে না। তাহলে শুন, ছোট মহাজন আরেকবার চেষ্টা করে—কর্জ ছিল তিন কুড়ি পন্দ্র টাকা, এখুন বাজার হইল্—ষোল্ল টাকা সেই হিসাবে চার কুড়ি টাকায় পাঁচ মণ ধান—আর বাকী থাকে পাঁচ টাকা—এখুন ঐ পাঁচ টাকা লিয়ে সব ধান হামাক দিবা পারিস, না হয় তো এক কাঠা ধান লিয়েও যাবা পারিস।

মন্তাজ আলী তখনও বুঝতে পারে না দেখে ছোট মহাজন হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, যা, ইবার তোর বাপেরঠে যা—ঐঠে বুঝে লিস।

ছোট মহাজনের কথাবার্তা মন্তাজের ভয়ানক দুর্বোধ্য লাগে। দেখলো মহাজন খাতা-পত্তর কম্বল-টম্বল গুছিয়ে উঠবার আয়োজন করছে। শুনতে পেলো হাসরদিন আর বেলাতালীকে ডাকছে ধানগুলো বস্তায় ভরবার জন্যে।

মহাজন যখন সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে তখন মন্তাজ আলী মুখোমুখি হলো, মাহাজন হামার ধান?

তোর ধান? আকাশ থেকে পড়ে যেন ছোট মহাজন। বলে, তুই তো আচ্ছা বেকুব রে মন্তাজ, হিসাবটা এতো বুঝানু তাহো বুঝলো নি। ছোট মহাজন হাই তোলে। ঘুম পেয়েছে তখন তার।

মন্তাজ আলী যেন কিছুই শুনতে পায় না। সে শুধু বলে, ই কেমন হিসাব মাহাজন, আধির আধা ভাগ হামরা পামো নাই?

ছোট মহাজন তখন পাশ কাটাতে পারলে বাঁচে। মন্তাজ আলী যে এমনি ক্ষেপে উঠবে সে ধারণা করতে পারেনি। বললো, বেশ তুই কাইল আসিস—কাইল দেখা যাবে—আইজ বাড়িত যা। এখুন আর দিক করিস না, বহুত রাত হইছে।

মন্তাজ আলী তখন স্তূপীকৃত ধানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বিমূঢ় ভাবটা তার কাটছে। মনে পড়ছে গত চার মাসের কথা। কী প্রচণ্ড রোদ ছিলো তখন, আর কী তুমুল বৃষ্টি নামতো আসমান থেকে। কচি কচি সবুজ চারা গুলোর স্পর্শ কী নরোম। রোপা দেয়ার সময় মাখনের মতো নরোম কাদামাটির ছোঁয়া যেন এখনো দুহাতে লেগে আছে। পায়ের নীচে শক্ত খসখসে খুদে খুদে দানাগুলোকে যেন এখনো অনুভব করছে সে। কুলোর বাতাসে আবর্জনা আর পাতান উড়িয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। এখন সেই ঝকঝকে ধানের একটি মুঠোও তার নয়। আগাগোড়া ব্যাপারটা ভারী অস্বাভাবিক লাগলো মন্তাজ আলীর। মনে হলো, ছোট মহাজনই বোধহয় বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। তখন তার কেমন হাসি পেলো। বললো, মাহাজন, হামার ধান হামরা লিয়ে যাছি।

কথাটা বলেই সে মনোযোগের সঙ্গে নিজের বস্তায় ধান ভরতে লাগলো।

মন্তাজ, পাগলামী করিস না, ছোট মহাজন হাঁকলো।

মন্তাজ সত্যিই বুঝতে পারে না। ছোট মহাজনের আচরণ তার কাছে ভারী অবাস্তব লাগে। মনে হয় ছোট মহাজন মিছিমিছি শাসাচ্ছে তাকে। তার সঙ্গে ঠাট্টা করতে চায় বোধ হয়।

ছোট মহাজন বোধহয় অনেকক্ষণ চিৎকার করছিলো। একবার মনে হলো আরেকজন কে এসে তাকে ধমক দিচ্ছে। ধান ভরা শেষ হলে যখন সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়েছে তখনই কে যেন ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিলো। ধাক্কা খেয়ে পিছু হটে সে দেখলো, বেলাতালী আর হাসরদিন তেড়ে এসেছে। তাদের পেছনে ছোট মহাজন তড়পাচ্ছে আর কী কী সব বলে অনগল গালাগাল করে যাচ্ছে।

মন্তাজ আলী কোনো কিছু আমলে আনলো না। এগিয়ে গিয়ে আবার ধানের বস্তায় হাত দিয়ে বললো, হামার ধান ইটা।

আর তক্ষুণি মুখ থুবড়ে পড়তে হলো তাকে উঠোনের শক্ত মাটিতে।

নাকের হাড়টা ঝনঝন করে উঠলো। তবু সে উঠে দাড়িয়ে ছুটে গেলো আক্রমণোদ্যত এক জনের দিকে।

আবার তাকে ধাক্কা খেয়ে পড়তে হলো। মাথার পেছনে একটা যন্ত্রণার পিণ্ড যেন এসে ঘা দিয়েছে। চারদিকে অন্ধকারটা হলদে রঙের দেখলো। পা দুখানাকে বশে রাখতে চেষ্টা করেও পারলো না। কেমন যেন পা দুখানা আস্তে করে ভেঙে পড়লো। কিছুক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন কে যেন তাকে ধাক্কা মারতে লাগলো আবার নতুন করে। ধাক্কা খেতে খেতে দেখলো, টলমল পায়ে সে অন্ধকারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। এক সময় পায়ে পায়ে হুঁচোট লেগে রাস্তার ধূলোর ওপর আবার পড়ে গেলো। পেছনে তখন কে ডেকে বলছে, লে শালা রাস্তাত বসে বসে ইবার ধানের ভাগ লিয়ে যা।

মন্তাজ আলী কিছুক্ষণ পর হাত দিয়ে মুঠো ভরে ধান নাড়তে চাইলো। ধানের বদলে মুঠো ভর্তি ধূলো উঠে এলো হাতে। শীতের বাতাস তখন শিস দিচ্ছে গাছের ডালে ডালে। কিছুই দেখা যায় না কোনো দিকে। মন্তাজ আলীর ঘোর কাটছে একটু একটু করে। সব মনে পড়ছে এখন। ছোট মহাজন, ধানের স্তূপ, তার স্বপ্ন, তার গাভীন গাই বাচচা বিয়োচ্ছে, ছায়ার মত দুই জল্লাদ তাকে খুন করতে উদ্যত।

রাস্তার ঠাণ্ডা ধূলোর ওপর থেকে উঠলো সে। গায়ের চাদরটা চট চট করছে, মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়েছে সম্ভবতঃ। মাথা তুলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সে হাঁটতে হাঁটতে এগুলো। এগুতে এগুতে গালাগাল দিলো নিজের শক্তিহীনতাকে। নিজের অক্ষমতাকে, নিজের নির্বুদ্ধিতাকে।

গোয়ালঘরের কাছে গিয়ে দেখলো আগুন জলছে। বাবা আর মা আগুনের কাছে হাত মেলে বসেছে। দূর থেকেই আরো দেখলো, দুচোখ ভরে দেখলো,

এক পুঞ্জ কোমল শুভ্রতা অন্ধকারের বুকে ফুটে রয়েছে। গরুটার মাথা সেই শুভ্রতার কাছে নোয়ানো। আগুনের আলোয় দেখা যায় গরুর ন্যাজের নীচে গর্ভের ফুল কালো আর চকচকে হয়ে ঝুলে রয়েছে।

সে মা বাপের কাছে গিয়ে বসলো।

মা দেখলো তাকে, বাবা দেখলো। মা আর্ত চিৎকার করে উঠলো ছেলেকে দেখে—হায় বাপ, কি হইছে তোর অঁা? হায় আল্লা অক্ক ক্যানে রে?

মস্তাজ আলী তখন বুঝিয়ে বলে। হতাশ না হয়ে, রাগ না দেখিয়ে একে একে বুঝিয়ে বলে! বলে তার নির্বুদ্ধিতার কথা মহাজনের হিসেবের ফাঁকির কথা। বুড়ি মা শোনে আর ছেলের মাথায় হাত রেখে আল্লাকে ডাকে। ছেলেকে শুকনো বুকের কাছে চেপে ধরে আদর করতে চায়। মস্তাজ আলী তখন অদূরে গরুটাকে দেখতে পায়। দেখতে পায় বাচ্চাটা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

বাবা তখনো হায় হায় করে—তোক এমন করে মারিল ছোট মাহাজন, অঁা? এমন করে মারিল তোক?

মস্তাজের কিন্তু উত্তেজনা নেই। বাপকে বোঝায় সে, মহাজন তো মারবেই। তার লাভ সে ছাড়বে কেন। যদি আমার শক্তি থাকতো। তাহলে—হাঁ, তা হইলে কি আর মারিবা পারে!

চুপ করে থাকে সবাই। মা বাবা সন্তান চুপ করে থাকে। আগুনে কাঠের টুকরো গুলো পুড়তে থাকে। পট পট শব্দ হয় কেমন। ঐ শব্দ শুনতে শুনতে, আগুনের শিখা দেখতে দেখতে আবার কথা উঠে আসে মস্তাজ আলীর মুখে। এবার মনোহর দাসের গানের কথা চলে আসে। ধান নিয়ে আধিয়ার কিষাণ যে লড়াই করেছিলো—সেই লড়াইয়ের কথা শুরু হয়ে যায়। মহাজন সেদিনও এমনি করেই মেরেছিলো। মহাজনরা চিরকাল এমনি করে মারে।

হাসন আলীর বুকের ভেতর কী যেন মুচড়ে মুচড়ে ওঠে—সেই সঙ্গে দুলে ওঠে আশঙ্কা। কিন্তু স্মৃতি? না স্মৃতি তখন সোচ্চার হয়। স্মৃতি তো নয়, যেন স্রোত।

কহিস না বাপ, উকথা কহিস না। উসব হামার বড় সাধের কথা। বড় ডর করে এখন। সোনাডাঙ্গার কান্দরত্ মানুষ তো নহে, মানুষের বান। বেশুমার আধিয়ার কিষাণ, কুন্ কুন্ মুলুকের মানুষ, কেহ জানে না। কহিস না বাপ উকথা, কেহ শুনে ফালাবে। কুনো আধিয়ার কিষাণ আর উকথা কহে না।

কিষাণের বড় সাধের কথা উসব, বড় মমতার কথা। অক্ত কি গো! অক্তের বান বহে গেল্। গুলি আর নাঠির কি আওয়াজ! রহিম শেখ মরে রহিল্। সান্তাল পাড়া জলায় দিলে আগুন লাগায়। মানুষের মুখের আওয়াজ তো নহে যেন আসমানের ঠাটা। মানুষের মাথার মগজ আইলের ধারে ধারে চান্দের আলোত্ চক চক করিল রাত ভর। আর শুনিস না বাপ।

বলতে বলতে ভয়ে শিউরে ওঠে হাসন আলী। তবু বলে যায়। নির্জন কুয়াশা ঢাকা অন্ধকার রাত। স্মৃতি কিন্তু ভয় পায় না। কেবলি মুখর হয়। কথা তো নয় যেন গান। মন্তাজ আলী বাচ্চা ছেলের মতো দুহাতের ভাঁজে ঘাড় গুঁজে কান পেতে শোনে।

ইদিকে মায়ের ভাঙাচোরা মুখে আগুনের শিখার প্রতিফলন কাঁপে। হাওয়া বইছে। উত্তরের হিম বয়ে আসছে সে হাওয়ায়। আগুনের আলোয় দেখা যায় বাচ্চাটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর কিছু নয়, চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে শুধু সেই রক্তের আর কান্নার গল্পের স্রোত এবং নবজাত গোবৎস জেগে থাকে মন্তাজ আলীর চোখের সম্মুখে।

লেলিহান সাধ

এখন ধানের মৌসুম। কুয়াশার মধ্যে অনাথ শিশুর মতো শুয়ে থাকে অন্ধকার। ধূসর কুয়াশার ভেতর দিয়ে চুঁয়ে-পড়া জোৎস্না এখন বড়ই করুণ দেখায়। মাঝে মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদ। উত্তরের বাতাস ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠতে চায়। শোয়া যায় না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিরশির শিরশির করে বাইরের হাওয়া ঢুকছে। খড়ের গাদার ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে বসতে হয়েছে।

কী জাড় রে বাপু। ইবার আঘন মাসেই হাড্ডি কাঁপাছে বাহে, না জানি মাঘত্ কি হোবে।

একজন ঠাণ্ডায় জড়ো সড়ো হয়ে কথা বলে।

হাঁ বাহে বেড্ডি জাড়। অন্যজনের স্বল্প মন্তব্য।

তারপর বসে থাকে। বাইরে হাওয়ার শব্দ শুনতে চেষ্টা করে। খোলা মাঠে বিল জমির বিস্তৃত কুয়াশার মধ্য দিয়ে এমনিতেই রোজকার বাতাস বয়ে যায়। সেদিকে কান পেতে রাখে দুজনে। অনুমান করতে চেষ্টা করে বাতাসের শব্দটা সোচচার হচ্ছে কিনা। বেসুরো আওয়াজ শোনা যায় কি না।

ঘরের ঝাঁপ বন্ধ। কিন্তু দেখো, হাওয়া ঢুকছে খড়ের বেড়ার ফাঁক দিয়ে। আঁধার কেটে কেটে ছুরির মতো ধারালো হাওয়ার ঠাণ্ডা দাঁত শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। মনোহর বর্মণ আর সবদর আলী দুই ছায়াশরীর থেকে থেকে হাতে হাত ঘসে। আর থেকে থেকে বলে ওঠে, ঈঃ, শালার কুন্ জাড় নামিল্ বাহে!

আগিন জলা মনোরদা, আগিন তাপি এক্ না—সবদর আলী আগুনের উষ্ণতা কল্পনা করে।

হাঁ ভাই, আর নহে ইবার আগিন জলাই, বেড্ডি জাড়, মনোহর নড়ে চড়ে ওঠে।

কিন্তক শালাইটা, শালাইটা কুন্ঠে রাখলো বাহে—আগুন আর উত্তাপের আশায় মনোহর বর্মণ হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই খুঁজতে আরম্ভ করে। আর দেশালইটা তখন যেন পাঁকাল মাছ, স্তূপীকৃত খড়ের ভেতরে কেবলি হারিয়ে যাচ্ছে।

দুই ছায়াশরীর দেশলাই খুঁজে পায় না। এবং একে অপরকে দোষ দেয় তখন। মনোহর ঈষৎ বিরক্ত হয়। কাঁপতে কাঁপতে অভিযোগ করে, তুই হারালো শালাইটা। বেড়ি বেচাল চলিস্ বাহে তুই।

বাহ্ মোর কী দোষ। সবদর আলী কৈফিয়ত খোঁজে, বিড়ি শুল্‌কালো তুই, এখুন মোর দোষ। মোরঠে বিড়িও নাই, শালাইও নাই।

খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে থাকে মানুষ দুজন। বাইরের বাতাস তখন থেকে থেকে ঝাপটা দিয়ে উঠছে। দুই ছায়াশরীর জানোয়ারের মতো চার হাতপায়ে উবু হয়ে হাতড়ে ফিরতে থাকে। হাতড়াতে হাতড়াতে একেকবার বাতাসের শব্দ শোনে। শোনে, আবার খোঁজে। দেশলাইটা এখন মূল্যবান বস্তু হয়ে উঠেছে। কেবলি মনে হচ্ছে, এখন যদি খুঁজে না রাখে তাহলে ওটাকে পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

অস্থির হাতে খুঁজতে থাকে—দেশলাইটা যেন পরম আশার বস্তু। সিন্দুকের চাবি হয়তো বা, কিম্বা হয়তো মুমূর্ষুর কোনো দৈবলব্ধ মহৌষধ। খোঁজে, কিন্তু দেশলাই তখন খড়ের ফাঁকে ফাঁকে, এঁকে বেঁকে, গলে গলে, চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে। তবু খোঁজার বিরাম নেই। খোড়ো বিছানা উল্টে-পাল্টে ফেললো, মেঝেময় এখন খড়—ইঁদূর গর্তের মাটি যেমন স্তূপীকৃত করে রাখে। কিন্তু দেশলাইটা আর পাওয়া গেলো না।

শেষে দুজনে বসে রইলো মুখোমুখি। কারো বলবার মতো কথা নেই। অন্ধকার হয়ে আসছে। ঠাণ্ডায় সেই কালো বরফের মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দুজনে হাঁটুর ওপর হাতের ভাঁজে মুখ ঢেকে অনন্তকালের জন্যে বসে রইলো।

বসে রইলো বাক্যহীন। দুজন মানুষ বসে থাকলে যা যা বলে তার কিছুই বলতে পারলো না। শুধু অপেক্ষা করে চললো, হয়তো বা বাতাসের বেগ পড়ে যাবে। তখন আবার তারা খড়ের বিছানায় চট পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে পারবে। সেই আশায় মনোহর বর্মণ একবার গাঁয়ের কথা ভাবলো। ভাবলো আরাম শয্যার কথা। মাটি-লেপা দেয়ালের ঘরে কেমন মিঠে উম—কী তোফা ঘুমোনো যায়। একবার ধূমপানের ইচ্ছে জাগলো আরেকবার ভাবলো, হাত বাড়ালেই হয়তো পেয়ে যাবে দেশলাইটা। কথাটা মনে হতেই হাঁটু থেকে হাত নামিয়ে নীচে খড়ের মধ্যে হাতড়ালো। তারপর না পেয়ে নিজেকে গালাগাল করলো। শেষে ডাকলো সঙ্গী সবদর আলীকে, সবদর!

উঁ, সবদর গলায় বিচিত্র টানা একটা শব্দ বার করলো শুধু।

বয়ারটা কমবে নাই মনে হছে।

ঐ টুকুই বলবার মতো কথা। ঝুপড়ির ভেতর থেকেই আবার সে বাইরের কথা ভাবলো। আবার ফিরে আসতে চাইলো গাঁয়ের কথা, ঘরের কথা—তার ঘরখানার খুঁটি বড় দুর্বল। চকিতে একবার নদীর কথা মনে এলো। নদীটাকে গত বছর বর্ষায় রাতের বেলা বিশাল আর শাদা দেখাতো। তারপর নদীর কথাও সরে গেলো মন থেকে। তখন আবার ঝুপড়ির মধ্যে বসে থাকা। বাইরে শুধু হাওয়ার শব্দ।

সবদর, আরেকবার ডাকলো মনোহর বর্মণ।

হুঁ।

মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ছোঁড়া। ঐ হুঁকারটুকু দিয়ে যেমনকার তেমনি বসে রইলো।

ঠাণ্ডাটা এখন শিরশির করে গা বেয়ে উঠছে। সম্ভবতঃ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মনোহর একবার উঠে দাঁড়াতে চাইলো। ভাবলো উঠে দাঁড়ালে শরীরটা টান টান হতো, কিছুটা ভালো লাগতো তাহলে। কিন্তু শালা মহাজন ঝুপড়ি বানিয়েছে একখানা দেখো, উবু হয়ে ঢুকতে হবে, মাথা নীচু করে বসতে হবে, হামা দিয়ে নড়াচড়া করতে হবে। দু'পেয়ে মানুষকে কেমন জানোয়ার দশায় রাখবার ব্যবস্থা, বোঝো।

সবদর, চল্ মাহাজনেরঠে যাই, ডাকে উঠাই শালাক—হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো মনোহর বর্মণ।

সবদর আলী যেন ঘুম থেকে জাগলো তখন। চোখ মেললো সঙ্গীর দিকে। তারপর হাসলো, মাহাজন তোর শ্বশুরের ব্যাটা কি না, তুই ডাকলেই উঠে আসবে উসব চিন্তা ছাড় মনোরদা, এখুন লক্ মারে বসে থাক, বাতাসটা থামলে দেখা যাবে।

মনোহর বোঝে সবদরের কথাই ঠিক। অস্থির হয়ে লাভ নেই। চুপচাপ বসে থাকাই এখন একমাত্র কাজ।

ক্যানে যে জাড় কালটা দেয় ভগমান। মনোহরের থেকে থেকে ক্ষোভ জাগে।

দুজনে তারপর পরামর্শ করে। একবার ভাবে মহাজনকে গিয়ে ডেকে লবে, একটু আগুনের ব্যবস্থা করা যায় কি না চেষ্টা করে দেখবে। আবার

মনে হয়, সোজাসুজি মহাজনের ঘরে গিয়ে ঠাঁই নিলেই বা কী হয়। কিম্বা মহাজনকে জানিয়ে গাঁয়ের দিকে চলে গেলেও তো পারে। মহাজন কি আর বুঝবে না।

কিন্তু কোনো বুদ্ধিই টেঁকে না শেষ পর্যন্ত। মনে পড়ে যায়, মহাজনের ঘরে আজ কাসেমালির বউ আছে। ডাকাডাকি করলে লোকটা রেগে যাবে, হয়তো মারধোর করে তাড়িয়েও দিতে পারে। তার চাইতে এই ভালো—বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বাইরে এখন হাওয়ার শব্দ আরো সোচচার হয়ে উঠছে। উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাস দমকে দমকে ঢুকছে কুঁড়ের ভেতরে। একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিমানের মতো দুই বন্ধু অনেকক্ষণ বসে বসে হাওয়ার ঐ খেলা দেখলো। দেখলো আর বুঝলো—বসে থেকেও কোনো লাভ নেই।

শেষে দুজনে ঘুমোবার জন্যে শেষ বারের মতো আয়োজন করলো। শরীর বিছিয়ে পা লম্বা করে দিলো। তারপর গায়ের ছেঁড়া চাদরে শরীর ঢেকে দুহাতে খড় বিছিয়ে দিলো নিজেদের ওপর। শেষে মাথা ঢেকে চোখ বুঁজলো। এবার ঘুমোবে—শালার ঘুম যাবে কোথায়!

খড়ের ঝাঁঝালো গন্ধে নাকের ভেতরটা তির তির করে। তা করুক—ভ্রূক্ষেপ করতে চায় না কেউ—তবু ভালো, যদি ঘুমোনো যায়।

মাথা মুখ শরীর সব কিছু এখন খড়ের স্তূপের নীচে। পাশ ফিরলে বিছানা এখন দোল খায়। হ্যাঁ, এইবার চাদরের নীচে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেললেই শরীরে উম ধরবে, আর তখন—তখন বাহে নিন্দামু মুই। নিন্দ আসে না বাহে। জাড়ে কাহারও নিন্দ্ আসে না। উতরিয়া বয়ার আর কুহার এমনই তেজ দেখো, হাড্ডি পর্যন্ত হিঙ্গল করে দেয়।

ওরা জানে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে সোজা উত্তর থেকে, যেদিকে ভোর বেলা সূর্যোদয়ের সময় তাকালে পাহাড়ের ঝলমল চূড়ো দেখা যায় সেই দিক থেকে। কিন্তু যে ঘন কুহা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতো ঝরে যাচ্ছে, ঢেকে দিয়েছে আসমান আর দিগন্ত—ধান ক্ষেত আর পৃথিবী যার জন্যে একাকার—সেই কুহার উৎস কিছুটা পশ্চিমে। আসলে গাঢ় এই কুয়াশা উঠে আসছে টাঙনের বুক থেকে। যাকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে এখন দিগন্ত আসমান আর ধান ক্ষেতের মতোই একাকার।

হ্যাঁ, একাকার। একাকার আর বিস্তৃত, জানা নেই কতো দূরে গিয়ে শেষ। কুহার বড়ই কুহক বাহে। চোখ আছে তুমার—কিন্তুক লজরটা চলে না, রাস্তা আছে কিন্তুক দেখা যায় না। কুহার ভিতর গাঁও নাই, বাগিচা নাই, ঘর নাই, মানুষ নাই—কিছু নাই। খালি একটা জিনিষ আছে—সে তুমার জাড়টা, শরীলের কষ্টটা। জাড়টা তুমার দেহের চামড়া কামড়ায়, মাংস কামড়ায়, হাড্ডি কামড়ায়—ছাড়ে না কিছুতে। মাহাজনের ধারের মতোন বাহে শরীলের ঐ জাড়ের কষ্টটা।

ছাড়ে না, কোনোমতে ছাড়ে না। ঘুমোবে কেমন করে। ঠাণ্ডা কেবলি ঢুকছে টাটি বেড়ার ফোঁকর দিয়ে। বিচালির ফাঁকে ফাঁকে। শিরশির শিরশির করে ঢুকে যাচ্ছে। প্রথমে পা জড়িয়ে ধরছে। ধীর স্রোতের মতো কণকণ করে উঠে আসছে হাঁটুর ওপর। তারপর হাড় বেয়ে বেয়ে ওঠে আসছে শিরদাঁড়া পর্যন্ত। বার বার আসছে। ঢেউয়ের মতো। একের পর এক। আর দুজনের শরীর থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

নাহ্,নিন্দ্ আর হবে নাই মনোরদা, সবদর আলি পারে না, উঠে বসে একসময়। বলে, শালার বাতাস নিন্দাবা দিবে নাই।

মনোহরও তখন উঠে বসেছে। সত্যিই বোঝা যাচ্ছে ঘুমোতে দেবে না এই বিশ্রী শীত। এক সময় তার মনে হলো, এভাবে থাকা ঠিক হবে না। একটা কিছু উপায় বার করা দরকার। শরীরের ওপরে বিছানো খড়গুলো সরিয়ে সেও উঠে পড়লো। বললো, চল সবদর,এহঠে পড়ে থাকলে ব্যামার ধরবে। একটা ব্যবস্থা করি।

আবার ব্যবস্থার কথা ভাবে মনোহর, ঐ পুরনো কথাই—এখন মহাজনের ঘরে গিয়ে ওঠা যায়, নইলে মহাজনকে ডেকে তুলে একটা আগুনের ব্যবস্থা হতে পারে, কিম্বা মহাজনকে জানিয়ে গাঁয়ের মধ্যেও গিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বার বার ঘুরে ফিরে মহাজনের রাগী চেহারাটাই মনে পড়লো। মনে হলো, মহাজন হয়তো দরজাই খুলবে না। আর যদি বা খোলে তো গরু পেটাবার পাঁড় দিয়ে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে। বড্ড বদরাগী লোকটা।

সবদর আলী উদোম গায়ে ছেঁড়া চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপটা একটুখানি খুললো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো চোখে মুখে। শুনতে পেলো বাতাস শিস কেটে যাচ্ছে ধানের পুঞ্জ এর ফাঁক দিয়ে।

বাইরের অন্ধকার এবার ঘোলাটে। কুয়াশায় কিছু দেখা যায় না। তারা না, চাঁদ না, মেঘ না! কেবল মনে হচ্ছে কাটা ধানের স্তূপীকৃত পাঁজাগুলো দানোর মতো থম থম দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনে আরেকবার তাকিয়ে দেখলো বাইরের দিক। আর দেখে কথা সরলো না কারো মুখে: এখন পষ্ট বুঝতে পারছে আজ রাতের এই ঠাণ্ডাটা ভোগাবে।

বাথানের গরুগুলার যে কি দশা হইল্ কে জানে, মনোহর অস্পষ্ট বলতে চেষ্টা করে।

রাখ তোর গরু। সবদর বিরক্ত হয় গরুর কথা শুনে। বলে, নিজের কি দশা হবে সেই কথা চিন্তা কর, নিজের 'অবস্থাটা কি হবে সেইটা বুঝে দেখ ভালো করে।

মনোহর বর্মণ মাথা ঝাঁকিয়ে সজাগ হলো। নিজের কথা ভাবতে চাইলো তখন। কিন্তু ভেবে পেলো না কিছু। কী ভাববে? শুধু বললো, চল পালাই।

কুনঠে, কুনঠে পালাবো তুই? সবদর মুখিয়ে ওঠে। বলে গাঁওত্ তোর তানে কে শেজা বিছায় রাখিছে।

ক্ষোভ নয়, সম্ভবতঃ ধিক্কার দিচ্ছে সবদর আলী। মনোহর বর্মণের জন্যে কেউ আরাম শয্যা পেতে রাখেনি। দরজা খুলে কেউ তাদেরকে ঘরের ভেতরে ডেকে নেবে না। মনোহর জানে না তা নয়। মনোহরও জানে এসব। তবু বলতে চায়। আশার কথা সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভালো লাগে বলেই হয়তো বলতে চায়। বলতে চায়, আরাম শয্যা হয়তো কেউ পেতে রাখেনি তাই বলে ডাকলে কি আর কেউ দরজা খুলে ঘরের ভেতরে ঠাঁই দেবে না। গাঁয়ের মানুষ বলেও তো নিশ্চয় কিছু মায়া মমতা আছে। এসব বলতে চায় কিন্তু বলে না। বলে লাভ নেই, সবদর শুনতে চাইবে না। সে এখন স্থির চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোঁড়ার গায়ে বড্ড রাগ। একটুতেই গর্জে উঠতে চায়। পরশু দিন মহাজন তার পিঠে একখানা কঞ্চি ভেঙেছে। তবু দেখো এখনো কেমন ক্ষেপে উঠতে চাইছে। মনোহরের মনে হলো সবদর আলী সম্ভবত এখন অন্য কথা ভাবছে। কে জানে, হয়তো মেয়ে মানুষ নড়ছে তার মগজে।

হারামজাদা ঐতেই মরেছে। মনোহর বর্মণ জানে, ছোঁড়াদের রক্তে মেয়ে মানুষের সাধ উথলালেই এমনি বিপদ হয়। কতোদিন বোঝাতে চেয়েছে, আরে বাপু, তোর বাপ নাই, মা নাই, কেহ নাই—তোর ভুঁই নাই, ঘর নাই—তোর

ক্যানে এতো বেহার সাধ। তুই ক্যানে মানুষের বহুবেটির দিক নজর দিবো ? কিন্তু কার কথা কে শোনে।

সবদর আলী ঝাঁপ বন্ধ করলো আবার, বাইরে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। ঝাঁপ বন্ধ করেই সোজাসুজি তাকালো। তারপর মনোহর বর্মণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধালো, এখন কী করবো মনোরদা ?

মনোহরের তখন কাঁপুনি ধরেছে। চোয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে। একবার শুধু চকিতে মনে হলো, এখান থেকে সরে পড়া দরকার। কিন্তু কোথায় পালাবে ভেবে পেলো না। সরু আলের উপর দিয়ে পাঁচ মাইল দূরত্বটাকে এখন দুস্তর মনে হচ্ছে। কুয়াশায় কিছুই চোখে পড়ে না।

সবে ধান কাটা শুরু। গরু ছাগল মানুষ গাড়ীর চলাচল বাড়লে এক সময় হয়তো মাঠের মাঝখান দিয়ে লিক পড়বে। তখন তাই দেখে আন্দাজে পথ চলা যাবে, কিন্তু সেও তো বেশ কিছুদিন পরের ব্যাপার। এখন চোখের সম্মুখে শুধুই কয়াশা—গাঢ় আঁধারে মেশানো বিবর্ণ কুহা। যে কুহার ওপারে দৃষ্টি চলে না। যা ভেদ করে পা চালালে গন্তব্যে পোঁছানো যাবে কি না তার ঠিক নেই।

কিছু বলতে পারে না মনোহর। কুয়াশা এমনই বিপজ্জনক। কিছুই বলা যায় না। একবার সে এমনি কুয়াশার রাতে এই কান্দরের বুকেই সারারাত ঘুরে মরেছিলো। সেই কথা মনে পড়ে যায়। আর চুপ করে থাকে। অস্থির হয় না। জীবনে অনেক দুর্যোগ দেখেছে সে। একবার তুফানে ঘরদোর উড়িয়ে নিলো। তুফানের সঙ্গে লড়াই করে জান বাঁচালো কিন্তু ভাগনেটা ঘর চাপা পড়ে মরে গেলো। তারপর সে বছর বানের ঢল নেমে এলো উত্তর থেকে। ভেসে গেল সে দক্ষিণে। পোয়াতি বউ গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছিলো—সেখান থেকে পড়ে সেই যে ডুবে গেলো আর উঠলো না। গরু দুটো খুঁজে পাওয়া গেলো না। সব গেলো, শুধু সে নিজে বেঁচে রইল। বোঝো মানুষের জীবন কেমন। আকাল হয়, বান-বন্যা ভেসে আসে—ভূঁইকম্প, ঝড় তুফান, রোগব্যারাম—মানুষকে কতো কিছুর মুখোমুখি হতে হয়। আর এসব দেখেই সে জানে, মুখোমুখি হয়ে অস্থির হতে নেই। অস্থির হয়ে কিছু লাভ হয় না। কপাল, আসলেই মানুষের কপাল। কপালে যা লেখা থাকে তাই হয়।

কিন্তু ঐ যে চনমনে তরুণ রক্ত, তাজা জওয়ানী---- সেই জওয়ানী কখনো কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে না। দোষটা তো ঐ বয়সের, খ্যাপামীটা তো ঐ রক্তের। সবদর আলী কি করবে!

সবদর আলী ইতিমধ্যে বার কয়েক ঝাঁপ খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখেছে। তারপর আবার ঝাঁপ বন্ধ করে পাশে এসে বসেছে। শেষে, অনেক্ষণ বসে থাকবার পর, উঠলো। বাইরে বিশ্রী কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। খামারে যে কুকুরটা বাচ্চা দিয়েছে, সম্ভবতঃ সেটারই চিৎকার। সবদর আলী, কে জানে কেন ভীষণ রেগে গেলো। আর রেগে গিয়ে টান মেরে খুলে ফেললো ঝাঁপটা। তারপর ডেকেলো, আয় মনোরদা, বাহার চল।

কিন্তু বাইরে কোথায় যাবে। খোলা কান্দরে হাওয়ার ঝাপটা ভীষণ আছাড় খাচ্ছে। উত্তর থেকে বাতাস শব্দ করে ছুটে আসছে। দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উথালপাতাল অন্ধকারটা দেখে নিলো দুজনে। তারপর পা বাড়ালো।

কিন্তু কোথায়? তক্ষুণি শুরু হলো বেদম বৃষ্টি।

বৃষ্টি, শীতের তীক্ষ্ণ বৃষ্টি। সবদর থমকালো, কিছু দূর এগিয়েও আবার ফিরে আসতে হলো।

মজা দেখ মনোরদা, সবদর ভীষণ হতাশ হয়ে বললো, শালা মাহাজন মায়া মানুষের গলা ধরে নিন্দাছে আর হামরা জাড়ে মরে যাছি। দুনিয়ার বিচারটা দেখ।

মনোহরের স্মৃতিতে তখন চকিতে মেয়ে মানুষের ছবি দোল খেয়ে গেলো। কাসেমালির বউকে বুকে নিয়ে মহাজন এখন ঘুমিয়ে আছে। মেয়ে মানুষের শরীর বড় গরম, ঘুমোতে ভারী আরাম। সুবলা দুহাতে পেঁচিয়ে ধরতো গলা। সারারাত অমনি বুকের মধ্যে পড়ে থাকতো। দীর্ঘশ্বাস বার হয় মনোহর বর্মণের। কপাল, নেহাতই কপাল। নইলে সুবলার মতো এক খানা দশাসই বউ, ভরপেট পোয়াতি, তখন অমন করে বানের জলে ভেসে গেলো। অমন গরম শরীল সেই শরীল হয়ে গেলো হিম ঠাণ্ডা। বোঝো!

সবদরকে বলে, মাহাজন যা খুশি করুক, তোর কি তাতে? তোর যেমন কপাল তেমনই তো হবে!

হ্যাঃ, সবদর আলী থুথু ফেলে, কপালের কথা আর শুনাইস না মনোরদা, কপাল কি আর এমনি হয়।

ছোঁড়ার মেলা অভিযোগ। মহাজনকে বললো, ইবার ধান মাড়ি মাহাজন, জাড়ের কাপড়া কানি দরকার। মহাজন সে কথা শুনলো না। শুনলো না কিন্তু ধান মাড়াই হলো। স্তূপাকার ধান বস্তা ভর্তি হয়ে হাটে চলে গেলো। দিনিয়ার মজুরের কপালে জুটলো না একটি মুঠোও। শুধু ডেকে বললো, তুমার হিসাব লিখা রহিল্, পরের বার ধান লেন। কাণ্ডটা দেখো! ধান কেটে আনা, মাড়াই

ঝাড়াই করা, মহাজনের গোলায় তুলে দিয়ে আসা---সব কিছুর মজুরী ষোল ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ঐ একভাগ দিতেই মহাজনের হাত উপুড় হয় না। চোখ লাল করে থাকে সর্বক্ষণ। ইদিকে কপাল দেখো লোকটার। কাসেমালির বউকে নিয়ে শুয়ে থাকে রাতভর, এখন আবার রহিমুদ্দিনের বিধবা মেয়েটাকেও বিছানায় শোয়াবার তাল খুঁজছে। ওদিকে আবার দেখতে না দেখতে দেনার দায়ে মহিন্দরের জমি হাতের মুঠোয় এনে ফেললো। তার সব আছে, তবু দেখো, একে একে আসছে কেমন অঢেল। কিন্তুক হামার তানে কিছু দিবা চাহে না। ভিখ্ নয়, মেহনতের দাম, তাও দিবা চাহে না।

একে একে বলে যায় সবদর আলী। কাঁপতে কাঁপতে বলে যায় জ্বালার কথা, অপমানের কথা, ক্ষুধার কথা। কখনো গলা সোচ্চার হয়, কখনো আবার বাইরের হাওয়ার শব্দে গলা ডুবে যায়। কথা বলার সময় চোয়াল থরথর করে উঠছে। কিন্তু থামতে চায় না ছোঁড়া। ইদিকে মাথার ওপরকার চাল চুঁইয়ে পানি গড়াতে আরম্ভ করেছে। বৃষ্টিটা বোধ হয় জোরে নামলো।

মনোহর ঝাঁপ খুললো, আর নয়, এবার বাইরে বেরুবে। এখানে, এই কঁড়ে ঘরে পড়ে থাকার মানে নির্ঘাত মরণ।

বাইরে পা রাখবে, আর তখনই চিৎকার করে উঠলো সবদর আলী, মনোরদা।

কিরে, কি, মনোহর মুখ ফেরায়।

ছোঁড়া তখন কথা বলতে পারছে না। দাঁতের পাটির বেসামাল কাঁপুনির ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুলো শুধু, শালাইটা মনোরদা, শালাইটা!

যেন মণিমানিক্য কিছু। উল্লাস লাফিয়ে উঠলো বুকের ভেতরে। দেশলাই, তার মানে উত্তাপ, তার মানে নরোম ঘুম আবার।

জ্বলা, জ্বলা রে ভাই, মনোহর অস্থির হয়ে ওঠে।

তখন চাল থেকে গলগল করে পানি নামতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কপাল বলতে হবে। দেশলাইটা ভেজা নয় একেবারে।

কাঠির টোকা মারতেই হাতের আড়ালে কেমন নীল আলোর শিখা জ্বলে উঠলো। আঃ কী সুখ, আগুনের শিখাটুকু দেখেই শরীরের কাঁপুনি থেমে যাচ্ছে যেন। কাছাকাছি বসলো দুজনে। একমুঠো খড় দেশলাইয়ের শিখার ওপরে ধরলো। কিন্তু দেখো, জ্বললো না খড়, খড়গুলো ভেজা।

মনোহর তখন খাবলা মেরে খড় তুললো আরেক মুঠো। আবার কাঠি ঘষলো দেশলাইয়ের পিঠে এবং এবারও শিখা জ্বলে জ্বলে নিভে গেলো।

তখন দুজনে পাগলের মতো কুঁড়ের ভেতরে চারদিকে হাতড়ে ফিরলো। যদি একমুঠো শুকনো খড় পায়। যেখানেই হাত দেয়, সেখানেই শপশপে ভেজা। শুকনো নেই কোথাও। আশা নেই কোথাও। অন্ধকারে আশা থাকে না।

আবার চুপচাপ বসতে হলো। বিমূঢ় বসে বৃষ্টির শব্দ শুনলো। থেকে থেকে আসমানে কেমন গড় গড় শব্দ হচ্ছে। সবদর আলী দেশলাইটা বাইরে বৃষ্টির দিকে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিলো। মনোহর হাত চেপে ধরলো, পাগলা হইছি নাকি এঁ্যা! রাখ ইটা, কোমরত্ বান্ধে রাখ। ইটা ফালায় দিলে আগিন কুন্‌ঠে পাবো?

এবার আর কুঁড়ে ঘরে থাকবার কোনো কারণ নেই। পায়ের পাতা ছাপিয়ে উঠেছে পানি। কুঁড়ের ভেতর ধারাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে। হাওয়ার প্রবল একটা ঝাপটা এসে ছিঁড়ে দিলো ঝাঁপের বাঁধন।

আর ঠিক এমনি সময় বেরিয়ে পড়লো দুজনে। ধানের পুঞ্জ্গুলোর আড়াল নিলো কিছুক্ষণ, তারপর এগুলো। একটু পরেই বৃষ্টির ফোঁটা কাঁটার মতো গায়ে বিঁধতে লাগলো। একবার ভাবলো ফিরবে, কিন্তু কোথায় ফিরবে? পেছনে আশ্রয় কোথায়?

খামার বাড়ীর সীমানা পার হবার আগেই বুঝে নিলো, হাতে পায়ে সাড় নেই। তবু থামবার কথা ভাবলো না। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো।

হেঁটে চললো, কিন্তু কোন দিকে? ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে, সবদিকে কুয়াশা অন্ধকার বৃষ্টি সব একসঙ্গে দাপাচ্ছে। কোন দিকে পথ? গোঁ গোঁ করে উঠছে বাতাসের বেগ। শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঝাপটা ধাক্কা দিচ্ছে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছু।

আসমানে বিজলি চমকায় না, চাঁদ এখন জোনাক ঝরায় না, তারা ঝিকঝিক করে না—কিন্তু দেখো, বাতাস আর বৃষ্টি ঠিকই চাবকে যাচ্ছে। দেখো বা না দেখো, সামনে তোমাকে চলতেই হবে। একটু পর ওপরে নজর তুলতেই পা থেমে গেলো দুজনার। হঠাৎ দেখলো, বিশ্বচরাচর জুড়ে নীল আলোর আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসের গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন শূন্যলোকে জ্বলে উঠেছিলো নীল আলো আর সেই আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন পূব থেকে পশ্চিমে, লেগে রয়েছে আভার মতো আকাশময়। বৃষ্টি, অন্ধকার, কুয়াশা সবার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই নীল আভা। আর মানুষ দুজন দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিশাল আসমানের সেই চেহারা দেখলো অনেকক্ষণ ধরে।

মনোহর বর্মণের তখন ভগবানের কথা মনে হলো। রাম রাম বলে উঠতে চাইলো। কিন্তু বললো না, ডাকলো না ভগবানকে। বিমূঢ় অবস্থায় সম্ভবত মনে হয়েছিলো আসমানের ঐ নীল আভা ঈশ্বরের কোনো দৈবলীলা। হয়তো ঈশ্বরের কোনো ইঙ্গিত জানানো হলো মানুষকে। এবার হয়তো অগ্নিকাণ্ড হবে কিম্বা ধেয়ে আসছে মড়ক, আবার প্লাবনও হতে পারে। নানান আশঙ্কা চমকে চমকে গেলো মনের মধ্যে। কিন্তু কিছু বললো না। কথাটা মনে মনে গোছাতে চেষ্টা করলো, ডাকলো একবার সঙ্গী সবদর আলীকে। কিন্তু কথাটা গোছাতে পারলো না। শুধু বললো, ইবার মনে হয় বান আসিবে।

বান আসবে, প্লাবনের ঢলের মতো, সেবারে যেমন জলপাইগুড়ি তেঁতুলিয়া থেকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিলো মানুষ গরু ঘরবাড়ি, যে বানের জলে ডুবে মরলো মনোহরের পোয়াতি বউ—সেই রকম বান। সবদর আলী কল্পনা করলো ভয়াবহতাটা। কিছুক্ষণ আগে দেখা আসমানের চেহারাটা মনে এলো সেই সঙ্গে। কিন্তু ভয় লাগলো না। আল্লার নাম উচ্চারণ করলো না। কল্পনা করলো, সবাই ভেসে যাচ্ছে--মানুষ গরু মহাজন কাসেমালীর বউ গাছ ঘরের চাল সে নিজে মনোহর বর্মণ—সবাই একসঙ্গে ভাসছে। তখন হাসি পেলো তার। কিন্তু হাসলো না, শুধু ডাকলো, মনোরদা।

মনোহর সাড়া দেয় না। সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। শুধু কান পাতে।

মনোরদা উটা বুঝিন জ্বীন টিন হবে, কি কহিস ?

মনোহর বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার মুখে হাসি দেখতে পায়। সবদর আলী হাসছে কেমন দেখো। ভয় ডর নেই ছোঁড়ার। অন্য সময় হলে ধমকে দিতো। এখন শুধু বললো, উকথা কহিস না, কহিবা নাই উকথা।

ক্যানে ? সবদর আলী হাসে। পাগল হয়ে গেলো নাকি ছোঁড়া ? মনোহর ভেবে পায় না কি বলে থামাবে হারামজাদাকে। শুধু বলে, চুপ থাক সবদর—হাসি মাজাক ভালো নহে বাপু।

কিন্তক জ্বীন হইলেই বা হামার কি কহ ? যুদিন ভূত হয় তা হইলেই বা হামার কি ! হামার কী ক্ষতি করবে শালা।

হাঁটে দুজনে, আর থেকে থেকে সবদর আলীর গলার স্বর উচচকিত হয়ে ওঠে। একেকবার হুঁচোট লাগলে গাল দিয়ে ওঠে ছোঁড়া।

বাতাস এবার মুখোমুখি। মাথা ঝুঁকিয়ে রাখতে হচ্ছে নইলে চোখের ওপরে এসে লাগে বৃষ্টির ফলা। এবারে চলনটা হয়েছে ঠিক জানোয়ারের

মতোন। বৃষ্টি ভেজা জানোয়ার যেমন উবু হয়ে হেঁটে যায় তেমনি হয়েছে মানুষ দুটির অবস্থা। আলের ওপর ঝুঁকে পড়া ভেজা কাশঝাড় হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে পারছে না এখন। ইচ্ছে থাকলেও হাত এখন আর ইচ্ছের অধীন নয়।

কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। তবু একেকবার মনে হয় বাঁয়ে বোধ হয় গোঁসাইপাড়া, ডাইনে হাড়িটোলা। একবার মহাজনের কথা আবার ফিরে আসে। কখনো মনে হয় নেকমরদের মেলার কথা। মগজের ভেতরে নানান ভাবনা এখন খেলা করে। নানান ইচেছ আর সাধ জ্বলছে আর নিভছে।

এখ্‌ন একবার হাড়িটোলা গেলে হয় মনোরদা।

হ্যাঁ, এইটাই তো চাইছিলে তুমি। মনোহর বর্মণ মনে মনে গাল দিয়ে উঠলো। হারামজাদা জওয়ানী তোমার উথলে উঠছে। ঠাণ্ডা বাতাস দেখে মেয়ে মানুষের জন্যে লোভ লাগছে শালা বেকুব। মনোহর গাল দেয় মনে মনে। কিন্তু কথা বলে না। জানে, কথা বলে কোনো লাভ নেই।

দাদা শুনিছি, রঙ্গিলা নাকি পাইসা লেয়? সবদর আলীর গলায় বিচিত্র স্বর বেরুচেছ এখন।

যুবতী রঙ্গিলার কথা মনোহর বর্মণের মনে পড়ে গেলো। যৌবন যেন বুকের ওপর টলমল করে নাচছে সর্বক্ষণ। বাতাস লাগা দরিয়ার বুকে ঢেউয়ের মতোন। সেই রঙ্গিলা! হারামজাদার কপালে দুঃখ আছে।

মুই যামু একবার, দেখে লিস মনোরদা। চোয়ালের কাঁপুনি সামলাতে পারে না, তবু বলে হারামজাদা, দেখে লিস মনোরদা, মাহাজন যেদিন ধান দিবে ঐদিন, হ্যাঁ ঐদিনই হাটত্‌ ধান বেচে মুই রঙ্গিলারঠে চলে যামু। দেখে লিস তুই!

কিন্তুক, দাঁতে ঠোকাঠুকি বাজিয়ে মনোহর শুধায়, কিন্তুক ধান কে দিবে তোক?

ক্যানে? বাহ্‌ ক্যানে দিবে নাই!

পা হড়কে যেতে চায়। সামনে বোধহয় নীচু জমি। ধানের গোড়া পায়ে ফুটছে হয়তো। হাওয়াটা বোধহয় দিক বদল করলো, এবার ডান দিক থেকে ঝাপটা এসে লাগছে।

মহাজন ধান দিবে নাই। কিষাণের পেটের ভাত দিবা চাহে না, দেখিস দিবে নাই।

হাত পা অসাড়, কিন্তু বিড় বিড় করে বকে চলেছে মানুষ দুজন। আলাপ নয়—স্মৃতি জ্বালা ক্রোধ তখন একসঙ্গে সোচ্চার হচ্ছে দুজনের মনে। সবদর আলীর বড় সাধ ছিলো, রহিমুদ্দিনের বিধবা মেয়েটাকে নিকা করে ঘর বাঁধবে। কিন্তুক দেখো, মহাজনের নজরটাও ঐখানে। ক্ষেতের ধান বলো, ঘরের বউ বলো, আদরের মেয়ে বলো—সব কিছু গিলে খাবার জন্যে মহাজন মুখ মেলে বসে আছে। কাছে গেলে রহিমুদ্দিনের বেটি ভারী সর্বনাশা হাসি হাসে। বলে, ঘর বান্ধ্ আগে, তারপর আসিস। রাস্তাঘাটে আশনাই করে কুত্তা বিলাই আসমানে বিজলির মতোন চমকে ওঠে তার ধারালো হাসি।

রহিমুদ্দিনের বেটি সখিনা নয় শুধু, মায়ের কথাও মনে পড়ে। মা ছিলো আমার, বড় করুণ মা আমার। কান্দে কান্দে জার জার মা জননী। চৌধুরী মহাজনের বৌ-ঝিদের খুশি করবার জন্যে বুড়ি মা ধান ভানতে ভানতে গীত গাইতো। কিশোরী বয়সে শেখা, বিয়ে বাড়ির রসালো গীত। হায় গো, মায়ের কী অপমান! মাকে গাইতে হতো—কাপড়া কুনঠে পালো গে মোহলা, গাহানা কুন্ঠে পালো। দোলার বিবি শাড়ি পেলি কোথায়, গয়না কে দিলো তোকে। আসবার পথে দোকানীর সঙ্গে আশনাই করে জুটিয়ে আনিস নি তো!

মহাজনের ছুকরি বউবেটিদের খুশি করার জন্যে ঐ অশ্লীল গান গাইতো মা জননী। সবদর আলী স্মৃতিতে দেখতে পায়—চোয়ালের হাড় উঁচু, দাঁত বেরিয়ে আসা রুগ্ণা মা. শনের মতো চুল মায়ের। মা, দেখো, শীতের রাতে ছেলের গায়ে কাঁথা ঢেকে দিচ্ছে।

মনোহর বর্মণের স্মৃতিতেও তখন গান। কেষ্টলীলার গান গাইত সুবলা। যখন আসমানে জ্যোৎস্না, দেবী পূজার গন্ধ ভাসে বাতাসে, তখন গুণ গুণ করে গান গাইতো সুবলা। সই গে যমুনার ঘাটত্ আর নি যামু, সোনার যৈবন মুই কুনঠে নুকামু। পা দিয়ে কোমর সাপটে ধরতো যুবতী বউ। আর ছেলে? ছেলে জন্ম নেয় নি, কিন্তু পেটের ভিতরে তখন সাড়া দিয়ে উঠতে শিখেছে। একেকদিন হাত বোলাতো বউয়ের পেটে। পষ্ট বোঝা যেতো শব্দ হচ্ছে ভেতরে, ছেলের প্রাণস্পন্দনের শব্দ, ধি-ক ধিক, ধি-ক ধিক।

স্মৃতি দেখতে দেখতে চলেছে মানুষ দুজন। কখনো হুঁচোট খাচ্ছে। কখনো পিছলে যাচ্ছে, পায়ের তলায় থেঁতলে যাচ্ছে পাকা ধানের শীষ। কাদায় গড়িয়ে পড়লে গাল দিয়ে উঠে আবার হাঁটছে।

এক সময় অন্ধকারে ডুবে থাকা কান্দর জেগে উঠলো সমুদ্র মোহনায় দ্বীপের মতো, অন্তরীক্ষে যে নীল আলোর আভা ছড়িয়ে গিয়েছিলো তাই যেন এখন ভেসে উঠলো কান্দরের বুকে। চারদিকের শূন্য অন্ধকারের মাঝখানে ধূসর কুয়াশার স্তর গাঢ় হলো আরো। তারপর যেন মৃত্যুর মতো থাবা বাড়িয়ে দিলো সামনের দিকে। স্মৃতিতে যে মানুষ দুটি বিচরণ করছে তখন, কেবলি হাত বাড়াতে থাকলো তাদের দিকে। কখনো বিষধরের হিমস্পর্শ হয়ে গেলো অনুভূতিতে, কখনো প্রকাণ্ড ক্ষুধা হয়ে নাড়ির ভিতরে ঢুকে জ্বালা ধরালো, কখনো আবার গোরস্তানের বিশাল ভয় হয়ে থমথম করে দাঁড়ালো সামনে।

কিন্তু মানুষ দুটি তখনো স্মতিবাসী। ভয় নেই, চেতনা নেই, জ্বালা নেই, স্মৃতিতে রৌদ্রোজ্জ্বল উষ্ণতার মধ্যে স্নান করে চলেছে তারা। কখনো রুগ্না মায়ের মুখ দেখছে, কখনো দেখছে অন্তঃসত্তা মৃত বউয়ের বিশাল উদর; কখনো কিষাণের সভায় উৎক্ষিপ্ত হাতে দাবী জানাচ্ছে, আবার কখনো শুনছে সমবেত হুঙ্কারে মাঠ প্রান্তর কারা যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে। গুলি চললো দেখো বীরগঞ্জে, হতভাগারা তবু কান্দর জুড়ে ধান কাটতে নেমেছে।

স্মৃতির ওপারে স্মৃতি। মনোহর বর্মণের তখন বালক বয়স, সবদর আলির তখন জন্মই হয় নি। সেই হুজুগে মরে গেলো সবদর আলির বাপ। হায় গো মা জননী! আঁর কান্দিস না মা। হবে রে সুবলা, হামারও সব হবে।

দুজন নয়, যেন একজনের স্মৃতি। যেন একজনের জ্বালা, একজনের কান্না, একজনের সাধ। দুজন মানুষ তখন একজন হয়ে পথ হাঁটছে।

ইদিকে দেখো আসমান হঠাৎ থেমে গেলো। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো মাঝপথে। ঘোলাটে চাঁদের আলো ফুটে উঠলো কুয়াশার দেয়ালে। তখন শুধু হাওয়া বইছে তীব্র, ধারালো ছুরির মতো। ধান ক্ষেতের আলপথ ধরে শিস কেটে যাচ্ছে হাওয়া, পায়ে পায়ে দাঁত বসিয়ে যাচ্ছে। হাড়ের ভেতরে একটানা চিবোতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে কুয়াশাও কাটতে আরম্ভ করলো। পা চলতে চায় না আর, হাঁটু যেন জমাট হয়ে আসছে। কানের ভেতরে শব্দ ঢোকেনা, কে যেন ভেতরকার ফুটো বন্ধ করে দিয়েছে। আর ঠিক এমনি সময় মহাজনের পুরোনো খামার বাড়ির সীমানা দেখা গেলো। দেখা গেলো গোয়াল ঘরের পাশে মাথা দোলাচ্ছে ন্যাড়া আম গাছ। এক মুহূর্ত দাঁড়ালো দুজন। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে দেখলো, এখন আর একজন নয়, দূরে দূরে দাঁড়ালো দুজন। হাত ছোঁয়ালো গালে, হাত নয় মনে হয় অন্য কিছু।

পথটুকু পার হয়ে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অনেকক্ষণ লাগলো। দেখলো ভারী আরামের ঘর বানিয়েছে মহাজন। একদিক বাথান, সেখানে গাইগরু আরাম করছে—আর ইদিকে মস্ত চৌচালা ঘরে মহাজন। আম গাছের পাতায় পাতায় ঝড়ো শব্দ হচ্ছে। ঘরের ভেতরকার লণ্ঠনের লাল আলো ফুটে বেরুচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে।

মাহাজন, এ মাহাজন, সবদর চিৎকার করে উঠলো। স্খলিত আর বিচিত্র স্বর বেরুলো গলা দিয়ে। মনোহর বর্মণও ডাকলো, মাহাজন, এ মাহাজন।

একবার ভাবলো চৌধুরী মহাজন হয়তো মাঝরাতের ফূর্তি মারতে ব্যস্ত। লেপের উমের তলায় মেয়ে মানুষের শরীল চটকে চটকে গণগণে তাপ বার করার চেষ্টায় বেসামাল। আরেকবার মনে হলো মহাজন হয়তো কাসেমালির বউয়ের বিশাল বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। মহাজন ঘুমোক অথবা জেগে থাক, ঐ অবস্থায় সহজে বাইরের ডাক শুনতে পাবার কথা নয়।

কথাটা চিন্তা করলো আর সেই সঙ্গে গলার চিৎকারে জোর আনলো মনোহর, মাহাজন, এ মাহাজন!

দুই উজবুক দিনিয়ারের ডাক শুনে চৌধুরী যখন বাইরে বেরুলো তখন তার হাতে গরু তাড়ানো লাঠি।

কি চাই, এ্যাঁ, কি চাহিস তরা?

বেড্ডি জাড় লাগিছে মাহাজন।

চৌধুরী চমকে ওঠে দুই জানোয়ারের কথা শুনে। বলে, কি বললি হারামজাদা, জাড় লাগছে বলে পালিয়ে এসেছিস। এ্যাঁ, তারপর চিৎকার করে বললো, ভাগ শালারা, ভাগ বলছি, যা। বলতে বলতে লাঠি উঁচিয়ে ছুটে এলো।

মনোহর বর্মণ নড়লো না। সবদর আলি সরে দাঁড়াবার প্রয়োজন বোধ করলো না। দুজনেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো লোকটা কি রকম অহেতুক আস্ফালন করতে পারে।

তার পর একসময়, যখন বাতাস শোঁ শোঁ করে ওঠে, বুড়ো আমগাছের ডালপালা দোল খায়, তখন ক্রুদ্ধ লোকটাকে বাচ্চা ছেলের মতো মনে হয়।

ক্ষিপ্ত চৌধুরী তখন দাওয়া থেকে নেমে এসেছে। অবলীলাক্রমে গালাগাল করতে করতে ছুটে এলো আর শটাশট বাড়ি মারতে লাগলো দিনিয়ার দুজনের

গায়ে। মারলো আর গর্জে গর্জে উঠতে লাগলো। যাবো নাই, যা চলে যা, হারামজাদা ধান ফালায় চলে আসলো। এখুনো খাড়ায় আছিস! বলছে আর এলোপাথাড়ি পিটিয়ে চলেছে।

মনোহর দেখছে। যেন সে নয়, তার নিজের শরীর নয় অন্য কারো পিঠে লাঠির ঘা এসে লাগছে। সে দেখছে মানুষটা বড্ড তড়পায়। সর্বক্ষণ চোখ গরম করে আছে। একটুতেই শুধু লাফিয়ে ওঠে। বোঝো কী মানুষ। এই সব দেখতে দেখতে কেমন হাসি পেয়ে গেলো মনোহর বর্মণের। আরো দেখলো, দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে কাসেমালির ছেনাল বউ। তখন ডাকলো মনোহর, হাঁ বাহে, কেমন আছেন। সালাম চৌধুরী নজর ফিরিয়ে দেখলো পেছনে। মেয়েমানুষটাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফুঁসে উঠলো আরেকবার, এ্যাই মাগী, বন্ কর দুয়ারটা।

দরজা বন্ধ হলো। কিন্তু সম্মুখে তখনো দাঁড়িয়ে দুই জানোয়ার। সালাম চৌধুরী চিৎকার করে উঠলো সহ্য করতে না পেরে। চিৎকার করে লাঠি উঁচিয়ে আরেকবার ছুটে এলো। কিন্তু সবদর আলী মনোহর বর্মণ তেমনি দাঁড়িয়ে। নড়ে না, সরে যায় না, ভয় পায় না। বাতাস বয়ে যাচ্ছে তেমনি। স্পর্শে শানানো ছুরির ধার তেমনি প্রখর। আসমান একবার মেঘ দেখায় একবার চাঁদ দেখায়।

মারমুখো চৌধুরী মহাজনের আস্ফালন দেখে মনোহরের মুখে হাসি খেলে গেলো একটু খানি। চৌধুরী তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সবদর আলীর ওপর। লাথি মারলো, গাল দিলো, লাঠির ঘা মেরে চললো একের পর এক। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেলো সবদর আলী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটিতে। মুখ দেখা যাচ্ছে তার। মনে হলো সবদর আলী নয়, তার দাদা দীনবন্ধু বর্মণ। দীনবন্ধু বর্মণকে মারছে মহাজন। তারপর আবার মনে হলো, না দাদা নয়, বোধ হয় তার বাবা—আর বালক বয়সী মনোহর দূর থেকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। মনোহর বর্মণের স্মৃতি উথাল পাথাল করে। কান্না নয়, ক্রোধ নয়, যন্ত্রণা নয়—বিষণ্ন একটা ঢেউ দুলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতি। কখনো বাস্তবে কখনো স্বপ্নে। কখনো ধান, কখনো লড়াই, কখনো স্ত্রীর সপ্রেম আলিঙ্গন—সব ভাসছে কুয়াশার মধ্যে।

এক সময় মহাজন চলে গেলো। সবদর আলির কাছে গেলো তখন মনোহর। আকাশে ওদিকে মেঘ কাটছে। কালো কাচের মতোন আসমানে

তারা ঝকঝক করে উঠলো। চাঁদের আলোয় দেখা গেলো সবদর আলির মুখ কপাল ফেটে কালো রক্ত গড়াচেছ। ছোঁড়া উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে তখন। মনোহর হাত ধরে টেনে তুললো।

জীবন এমনই। কিষাণ এমনই হয়, মহাজনও এই রকম। ঝড় বৃষ্টি বাতাস সব এমনই হয়ে থাকে। রক্ত মাখা সবদর আলির মুখ ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নায় জ্বল জ্বল করে উঠলো। মনোহর নজর করে দেখলো মানুষটা টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচেছ। একবার বললো, পানি খামু দাদা।

কিন্তু পানি কোথায় এখানে। মনোহর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলো। কূয়োতলায় গেলে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। সবদর আলির ভার সে ঘাড়ে করে উঠে দাঁড়ালো তারপর সামনের দিকে এগিয়ে চললো। তখন মনে হলো, সবদর আলি নয়, নিজেকেই টেনে নিয়ে চলেছে সে। আহত কাতর ঠাণ্ডা শরীরটা তার নিজেরই।

শেষে একসময় দুজনে মহাজনের দাওয়ায় গিয়ে বসলো। মনোহর একেকবার সবদর আলির পিঠে হাত বোলায়। কেমন মনে হয় চিরকাল সে এমনি ভাবে হাত বোলাতে পারবে। আহা ছোট ভাইটি তার। একেকবার অজাত সন্তানের কথা মনে পড়ে যায়। আর তখন ভাবে সুবলার পেটে হাত বোলাচেছ সে।

সবদর আলি অবশেষে উঠে বসলো। থরথর করে কেঁপে যাচেছ দেহ। কাঁপুনির দমকে সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগছে। মনোহরের নিজের শরীরেও তখন কাঁপুনি ধরেছে। যে শরীর এতোক্ষণ সাড়া তোলেনি সেই শরীরই এখন প্রবল ভাবে সোচচার হয়ে উঠলো। ঘরের ভেতরে ওদিকে কারা যেন কথা বলে চলেছে। মেয়ে মানুষের হাসি খিলখিল করে বেজে উঠছে থেকে থেকে।

আর তখন সবদর আলির শীত বাধা নামতে চাইলো না। দাওয়ায় তুলে রাখা শুকনো খড়ের পাঁজার দিকে সে হামা দিয়ে এগিয়ে গেলো। ভারী জাড় বাহে, ভারী ঠাণ্ডা এখন—আর সহ্য হয় না—নিজেকেই শোনাতে লাগলো বার বার করে।

একটু পরই দেশলাই ঘষার শব্দ হলো। মনোহর দেখলো, তার বুদ্ধি চিন্তা বিবেচনা—তার অতীত স্বপ্ন স্মৃতি—সব কিছু একাকার করে জ্বলে উঠলো নীল শিখা। শিখাটি দুললো, ছোট হলো, তারপর লম্বা হয়ে লাল আলো ছড়িয়ে দিলো চারদিকে। খড়ের নীচে শিখাটি রাখলে দেখা গেলো ভারী ধীরে

একটি খড়ে আগুনটা সরে যাচ্ছে। একটা থেকে দুটো, সেখান থেকে পাঁচটা, দশটা, একশোটা। ধোঁয়া দেখা গেলো শিখার ওপরে আর তারপরই দেখা গেলো লাল আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চারদিকে সূর্যোদয়ের মতো। উত্তাপ এসে লাগছে গায়ে। আঃ ঝিম ধরে আসছে দেখো শরীরের ভেতরে। সবদর আলি উঠে সরে গিয়ে ঘরের দরজার শেকলটা তুলে দিয়ে এলো। ভারী কোমল লাগছে এখন হাওয়াটাকে। ঘুম কেমন ভারী হয়ে চোখের পাতা জুড়ে নেমে আসছে।

মনোহর বর্মণ আর সবদার আলী দুচোখ ভরে দেখলো, স্তূপীকৃত খড়ের আগুন বাঁশের চালায় গিয়ে ধরছে, লাফিয়ে যাচ্ছে একদিক থেকে আরেক দিকে। ঘরের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করছে, কোন মেয়েমানুষ যেন কাঁদছে কোথায়—কারা যেন সমানে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে বন্ধ দরজায়। দুজনের কারুরই তখন সেদিকে খেয়াল দেবার অবসর নেই। নয়ন ভরে দেখছে দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখাগুলোকে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধ, সারাজীবনের সব কিছু তখন চোখের সামনে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো। আর মানুষ দুজন প্রাণ ভরে তাই দেখতে লাগলো।

ভবনদী

দিন গেলো সন্ধ্যা হইল, ইবার হবি ভবনদী পার।

নদীর ঘাটে এসে এইরকম একটা গান গুনগুন করে উঠছিলো মনের ভেতরে। নসরদ্দিন গানটা কিন্তু সত্যি সত্যি গাইছিলো না। সরকারী রাস্তা যেখানে নদীর কাছে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে পড়েছে. সেখান থেকে সে তহবন গুটিয়ে নিয়ে হেঁটে আসছে। পানি ভেঙে ঝপর ঝপর শব্দ করে হেঁটে আসা। বিন্নাঘাসের গোড়ায় পড়লে পায়ের তলায় সূঁচ ফোটানোর মতো অনুভব হয়। তার পরও নজর ছিলো পানিতে জোঁকের ভীড় দেখা যায় কিনা। বানের পানিতে জোঁকের আনাগোনা বাড়ে। ঘোলা পানিতে দেখবে কালোর ওপর সোনালি রঙের লম্বা সুতো যেন চারদিক থেকে এঁকে বেঁকে চলে আসছে।

নসরদ্দিন পানিতে নামা অবধি একেকবার ঘোলা পানির চেহারা দেখছিলো, একেকবার জোঁকের দিকেও নজর রাখছিলো—এবং তার পরও তার মনের ভেতর থেকে ঐরকম গানের কলি জেগে উঠছিলো। গান গাইছিলো না, তবু তার মনে থেকে থেকে ঐ গানের মতোই একটা বিষাদাত্মক ভাব জেগে উঠছিলো।

আসলে এর কারণও ছিলো।

কারণ আর কিছু নয়, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি এবং সম্মুখে প্রসারিত দিবাবসান। যখন রাস্তায় নেমেছে মহাজনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে—হ্যাঁ, ঐ পথেও হাঁটু সমান পানির ওপর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে আসতে হয়েছে, তখনই চোখে পড়েছিলো পশ্চিমাকাশে ঈষৎ মেঘ এবং পাটল রঙের সূর্যাস্ত—আর ঐ সূর্যাস্তের নীচে যতোদূর দৃষ্টি চলে শুধুই শাদা শাদা পানি। আর তখনই জীবনের অনিত্যতার কথাটি সম্ভবত মনে হয়ে থাকবে। কিম্বা শিবদাস ঠাকুরের গাওয়া গানটিও মনে পড়ে থাকতে পারে। বস্তুতঃ তখন থেকেই ঐ গানের কলিটি গুনগুন করে উঠছিলো তার মনের ভেতরে।

তবে ঐ মনের ভেতরেই। সুর ধরে যে গুনগুনানি উঠবে গলার ভেতর থেকে—তা কিন্তু হচ্ছিলো না। কেননা যুগপৎ জোঁকের ভয় এবং কুশাগ্রে যেন পা না পড়ে এই চেতনায় তাকে সজাগ থাকতে হচ্ছিলো।

জীবন কি ? জীবন তো দুই দিনের বাহে। সুখ বলো, দুখ বলো—ধন বলো. দৌলত বলো—কিছু কি থাকে? কিছুই থাকে না। আল্লাহ দেখো কেমন সহজে তাঁর বান্দাকে নিয়ে চলে যায়। তখন সবকিছুই ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে হয়—

হাজী মহাজন এইরকম কথাবার্তা বলছিলেন তখন। সামনে আধিয়ার কিষাণেরা দাওয়ায় বসে উর্ধমুখী মহাজনের দিকে তাকিয়ে—আর মহাজন তখন সৈয়দপুরের পীর সাহেবের মতো সন্তপুরুষের বেহেশতী আভা সারামুখে বিকীর্ণ করে বিশ্বজগতের অনিত্যতা ও ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনা করছিলেন।

সারাপথ হাজী মহাজনের কথাটাই মনের ভেতরে নাড়া খেয়ে উঠছিলো। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেবলি মনে হচ্ছিলো—এই দুনিয়া, আসমান, বিস্তীর্ণ জায়গা জমি—এসবই মায়াময়। ভাসমান ধূসর মেঘ. শেষ বিকেলের সূর্যালোক—সবই অনিত্য। তার নিজের ক্ষেতে যে পানি জমেছে, বীজ ধান যে এখনো ফেলা হয়নি—এবং তাতে যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে ঐ পানি শুকিয়ে যাবে—এইসব সমস্যা এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীপুত্রকন্যা, পায়ে ঘা হয়ে যাওয়া হালের গরু, ঘরখানির জীর্ণদশা—এই সমস্ত দুশ্চিন্তার কথা তার মনে আসেনি। এমন কি বড় মহাজন যে আধিয়ারদের ডেকে নিয়ে এসে হয়রান করলেন অযথা--এ ধরনের বাজে ক্ষোভও তার মনে জাগে নি।

ঈশ্বরের কথা এমনিতেই মানুষকে উদাস করে দেয়। তদুপরি হাজী মহাজনের বর্ণনা। আহা কী বা ভাব তার, কী বা দরদ! বুকের ভেতরে যেন হাহাকার উঠে যায়—হায় খালি দুনিয়াদারী করে গেনু, পরকালের কড়ি জোগাড় হইল্ নাই কিছু। হায় বাহে, কা হোবে হামার। কী গতি হোবে মরণের পর।

রামদাস বর্মণও ছিলেন ঐখানে। বোষ্টম মানুষ, গলায় কণ্ঠী ধারণ করেন। মাঝখানে বলে উঠেছিলেন, হাঁ হাজী সাহেব, দুনিয়া আর কয়দিনের—তাঁর সন্ধান যদি না মিলে তা হইলে তো এ জনম বিরথা গেল।

রামদাস বর্মণের দেহবর্ণ গৌর--তিনি বসেছিলেন কিছুটা দূরে, ভিন্ন আসনে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থ হলে যে রকম আপ্যায়ন হওয়া দরকার, রামদাসেরও তাই হচ্ছিলো। তাঁর গলায় ঝোলানো জপমালার থলিটিতে ভারী সুন্দর রঙের সূচিকর্ম। ঐদিকে নজর দিলে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির আভাস পাওয়া যায়। ঠাকুরের বংশীটি অপটু সূচিকর্মের দোষে বুঝিবা কিছুটা বঙ্কিম—একেক সময় কাস্তে বলে ভ্রম হতে পারে।

রামদাস বর্মণ থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন এবং দীনবন্ধু দীনবন্ধু বলে উঠছিলেন।

আর তখনই শিবদাস ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। তার মন্দিরা দুটি আকারে ছোট কিন্তু ভারী মধুর আওয়াজ তোলে। পথ চলতে যে গানটি গায়—তখন সে তাই গাইছিলো। জনম গেলো সন্ধ্যা হইল ইবার হবি ভবনদী পার।

হাজি মহাজনের গানে কোনো আগ্রহ নেই, বরং কিছুটা বিরক্তি আছে। বিশেষতঃ ভিখিরী কন্ঠের ঐ বিধর্মী সঙ্গীতে তাঁর কখনো কখনো ক্রোধেরও সঞ্চার হয়ে যায়। কিন্তু তখন, অদূরে রামদাস বর্মণের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসীন এবং একপাল আধিয়ার কিষাণ উর্ধমুখী তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে, সম্ভবতঃ এই কারণেই ইঙ্গিতে ভিক্ষাদানের নির্দেশ জানিয়ে নিজ বক্তব্যের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন।

আর ঐ বক্তব্য ভয়ানক করুণ। নূহ নবীর কাহিনীর সেই ভয়াবহ বন্যা—নূহ নবী কীভাবে পুত্রকে ত্যাগ করলেন----আহা কী মর্মভেদী সেই দৃশ্য! কী সহজে ভুলে গেলেন সহায় সম্পদ বাড়িঘর। শুধু অবিচল এক জায়গায়—আর সেই অবিচল জায়গাটি হলো তাঁর ঈমান। তাঁর বিশ্বাস, ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস—-আর তাই নিয়ে তিনি কিশতীতে ভাসলেন।

হাজী মহাজন কেন ঐ নূহ নবীর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন বোঝা ভার। তবে একসময় তিনি নিজেই বললেন, দেখো কী মহিমা খোদাতালার—কী কুদরত তাঁর—আজ এই মুহূর্তে আমার মনে ঐ নূহ নবীর কথাটাই কেমন ঘুরে ফিরে চলে আসছে। উদিকে নদীতে বান আর ইদিকে দেখো কেমন বারবার নূহ নবীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।

হাজী সাহেব তখন, ঐ কথার পরে, কেমন অলৌকিক পুরুষের মতো হয়ে উঠলেন।

আর ঐসময় আরেকটি ঘটনা ঘটেছিলো। ঐ সময় বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত উমরালি এসেছিলো। এসে দাঁড়িয়েছিলো উঠোনে। দাওয়ায় বসে থাকা মানুষদের চাইতে যেন বা সে আলাদা। তার চুল ধূলি-ধূসর, দুচোখ লাল এবং কোমরের বস্ত্রখণ্ড শতচ্ছিন্ন। দেখে মনে হচ্ছিলো একটি প্রকাণ্ড হাহাকার নিঃশেষিত প্রায় —এখন সাড়া জাগলেও তার ভেতর থেকে করুণ কান্না ছাড়া আর কিছুই নির্গত হবে না।

মাহাজন!

কোনো একটি কথার ফাঁকে ডেকেছিলো হয়তোবা উমরালি।

কিন্তু কেউ শোনে নি। হাজী মহাজন তখন বর্ণনা করছেন মুসা নবীর কাহিনী। বিয়াবান মরুভূমির কথা হচ্ছে তখন। মুসা চলেছেন নগর ছেড়ে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে। পেছনে ফেরাউনের সৈন্যদল। কিন্তু দেখো নবীর কী মহিমা। খোদার কী কুদরত। দরিয়ার জলরাশি দুপাশে সরে গেলো, নবীজি হেঁটে পার হয়ে এলেন আর জালিম বাদশার সৈন্যদলের সলিল সমাধি ঘটলো।

মাহাজন!

একটু যেন ফোঁপানির ভাব ওঠে উমরালির গলায়।

হাজী মহাজন তাকান তখন, তাঁর ভাবের ঘোর কাটে বুঝিবা। শুধান, কি বাহে কি হইছে তোর?

মাহাজন মোর ছুয়াটাক বাঁচান!

মৃত্যুকাতর পুত্রের বর্ণনা কে দিতে পারে। উমরালির বর্ণনায় কিছুই পরিষ্কার হয় না। কেননা তার গলায় শুধুই হাহাকার। তবু বোঝা যায় তার একটি ছেলে রোগাক্রান্ত এবং তার চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থের বড়ই প্রয়োজন।

হাজী মহাজন তখন তসবীহতে মনোযোগ দিয়েছেন। পার্থিব ব্যাপারে তাঁর নিরতিশয় অনাসক্তি। উমরালির পুত্রের কথা তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। বরং বাইরের আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। রামদাস বর্মণকে জিজ্ঞাসাও করেন—আশু বৃষ্টির লক্ষণ আকাশে আছে কিনা।

আকাশ ভারী পরিষ্কার। আষাঢ়ের শেষ, কিন্তু ভ্রম হয় বুঝিবা আশ্বিন। রোদ অতিশয় চড়া। এই চড়া রোদ বন্যাকে ফাঁপিয়ে তোলে। রামদাস বর্মণ ঐ প্রসঙ্গই আরম্ভ করবেন বলে ভাবেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনীয় আলাপের সূত্র ঐ আকাশ বন্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে হারিয়ে যাবে ভেবে ইতস্তত: করতে থাকেন।

আর উমরালি! ঐ কদাকার, ছিন্নবাস পরিহিত মনুষ্যেতর আকৃতির উমরালি তাঁর মনের মধ্যে ক্রমেই বিরক্তি এবং অস্বস্তি যুগপৎ জাগিয়ে তুলতে থাকে। একবার ভাবেন, তিরস্কার করবেন, কিন্তু পারেন না। তিরস্কার কি ছিন্নবাস পরিধানের জন্য অথবা কদাকার চেহারার জন্য করা যায়? ঐশী চিন্তায় যাঁকে দিন কাটাতে হয়, তিরস্কার যে তাঁর মুখে সাজে না।

উমরালি তবু বলতেই থাকে। পুত্রের রোগকাতর আর্তনাদের ভাষা তার বিকৃত কণ্ঠস্বরে কিছুটা হাস্যকর শোনায়। স্খলিতকণ্ঠ পুরুষের গলায় শিশুকন্ঠের আর্তনাদের অনুকরণ কি আসে? আর তাই হাজী মহাজন তখন কিছুটা কৌতুক বোধ করেন। কৌতুক আর কিছুতে নয়—বয়স্ক পুরুষ

উমরালির আচরণ হয়েছে শিশুর মতোন—এইটিই কৌতুক। তার কেবলি কাকুতিমিনতি—হামার সব লেন মাহাজন, ঘর বাড়ি ভিটামাটি সব লেন, খালি ছুয়াটাক বাঁচান, ডাক্তর ওষুধের খরচটা দেন।

ঘুরে ফিরে ঐ একই কথা! পয়সা এবং লোভ। পয়সা শরীর সেবার জন্য এবং লোভ আয়ু লাভের জন্য। জীবনের আসক্তি এই মুর্খদের কবে যে কাটবে! হাজী মহাজন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তখন।

ইতিমধ্যে রামদাস বর্মণ তাঁর প্রয়োজনের কথা শেষ করেছেন। দশমণ বীজধান বড়ই দরকার। হাজী মহাজন গোমস্তা ডাকিয়ে ঐ প্রয়োজন পূরণের আদেশ দিলেন নির্বিকার ভঙ্গীতে, যেন এ তাঁর দৈনন্দিন কর্মের ব্যাপার। এতোসব হলো—কিন্তু উমরালির হাহাকার থামে না।

হাজী মহাজন অবশেষে বুঝিবা সদয় হন। হাজার হলেও আল্লার বান্দা তো! কাছে ডাকেন লোকটিকে। তারপর বুঝিয়ে বলেন উমরালির বিপদের কথা স্মরণ করে বড়ই কষ্ট হয়েছে তাঁর। কিন্তু টাকা পয়সা ও দুনিয়াদারী বিষয় আশায় তো তিনি ত্যাগ করেছেন। তাঁর দেবার মতো কিছু নেই—শুধু দোয়া করতে পারেন তিনি। আর যদি উমরালির ঈমান দুরস্ত থাকে তবে দোয়াতে ছেলেটি নিশ্চয়ই সুস্থ হবে।

হ্যাঁ, ঐ ঈমান—ঈমানের মহিমাটুকু বোঝা চাই।

উমরালি আশ্বস্ত হবে কি না বুঝতে পারে না। সমবেত আধিয়ার কিষাণদের দিকে তাকায়—বুঝিবা আশ্বস্ত হবার জন্যে সঙ্গী খোঁজে।

হাজী মহাজন কিন্তু সমবেদনা প্রমাণ করে দেন একেবারে। একটুকরো কাগজে পবিত্র দোয়া লিখে উমরালির দিকে বাড়িয়ে বলেন, লে বাহে উমরালি, এই দোয়া তোর ব্যাটার গালাত্ বান্ধে দিস—আর আল্লাক ডাক বাহে।

একটু থেমে আবার বলেন, তুমার বড় মাহাজন আসোক, মুই কহে দিমু, টাকা পাইসাও কিছু পাবো।

হ্যাঁ, বড় মহাজনের জন্যেই অপেক্ষা। বড় মহাজনের কাছেই দুনিয়াদারীর হিসাব। তাঁর কাছেই গোলাঘরের চাবী তাঁর কাছেই সিন্দুকের ছোড়ান। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি? আধিয়ার বীজধানের জন্যে অপেক্ষা করবে, কিষাণ খোরাকির জন্যে অপেক্ষা করবে আর উমরালি ছেলের চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করবে। আধিয়ার কিষাণ আর দরিদ্রের বিধাতা ঐ বড় মহাজন। সবকিছুর উৎসে ঐ একটি মানুষ।

হাজী মহাজন কিছুক্ষণ তদগতচিত্ত হয়েছিলেন। চোখ ছিলো নিমীলিত, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ নড়ছিলো আর ইদিকে আধিয়ার কিষাণের দল একটি দুটি করে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলো।

উমরালি শুন্ বাহে, হাজী মহাজন আবার চোখ খুললেন। বললেন, বুঝে রাখিস, টাকা পাইসা নহে, ডাকতর ওষুধও নহে—আসল হইল্ ঈমান। ঈমানটা দুরস্ত্ কর, জিন্দেগী আর কয়দিনের বাহে। আল্লার জিনিষ যদি আল্লাহ লিয়ে যায় তো তুই ঠেকায় রাখিবা পারবো? কহ? আল্লাক ডাক বাহে, আল্লার উপর ভরসা রাখ।

ঐ কথায় উমরালি সত্যিই বোধহয় বুঝে যায়। অন্ততঃ তার চেহারায় অবুঝের অসহিষ্ণু ভাবটা আর থাকে না। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তখন সে কেবলি ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

হাজী মহাজন আবার মৃত্যু প্রসঙ্গে এসে যান সহজেই। তিনি আরবী আয়াত উদ্ধৃত করেন একের পর এক—এবং পুনরপি ঘুরে ঘুরে সেই আগের বক্তব্যে ফিরে যান। ফিরে যান জীবনের সেই অনিত্যতার প্রশ্নে। ধন, সম্পদ দুনিয়াদারী সবই মায়া। এই দুনিয়ায় যতোদিন থাকে মানুষ, ততোবেশী লোভী হয়—ততো বেশী গোমরাহা হতে থাকে—বরং যতো আগে যাওয়া যায়—হ্যাঁ উমরালির ছেলেটি বড়ই ভাগ্যবান যদি সে এই বয়সেই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে পারে। বেহেশতী ফুল হয়ে আসে শিশুরা, এখন সে বেহেশতী ফুলটি হয়েই চলে যেতে পারবে। এই রকম মরণে তো মন খারাপ করবার কিছু নেই।

ঐ ব্যাখ্যার মাঝখানে, কে জানে কেন—সম্ভবতঃ পুত্রের নামোল্লেখে—উমরালি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো একবার। কিন্তু তাতে হতাশাই ছিলো প্রধান। ক্ষোভ অথবা জিজ্ঞাসা ছিলো না আদৌ। আর সেই কারণেই হয়তো সমবেত আধিয়ার এবং কিষাণেরা হাজী সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে জীবন-মৃত্যুর কথা শুনছিলো। হাজী মহাজনের গলার স্বরটি ভারী সুললিত—ঐ স্বরযোজনায় কি না বোঝা যায় না—একসময় কেমন শরীরময় শিহরণ জেগে উঠতে থাকে। মনের ভেতরে কখনো ভয়, কখনো বা বেদনা আর কখনো বা আশা মুহুর্মুহু সঞ্চারিত, মথিত অথবা নির্বাপিত হয়। হায়, জীবন কী মায়াময়—কেহ তুমার নহে বাহে—স্বামী নহে, স্ত্রী নহে, সন্তান নহে—তুমার জবাব কেহ দিবে নাই রোজ হাশরের শেষ বিচারের দিন। কেহ চিনিবে নাই। খালি একজন চিনিবা পারে। আহা সে হইল্ হামার মুরশিদ। মুরিদ মুরশিদের সম্বন্ধ একদিনের নহে, কথাটা কিন্তুক বুঝেন বাহে—হাজী মহাজন তাঁর গভীরতর

উপলব্ধিটিকে যেন বা প্রকাশ করে দিতে চান। এবং শেষে ঈষৎ ক্লান্তি হয় তাঁর। ঘাড়ের শুভ্রবস্ত্রখণ্ড দিয়ে ঘাম মোছেন আর বিজয়ীর মতো সগর্ব ভঙ্গীতে মূর্খ দাসানুদাস আধিয়ার কিষাণদের উর্ধমুখী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কেহ বাঁচবে নাই, কিছু বাঁচবে নাই – ধানের গোলা, গোহালের গরু, ইস্ত্রী-পরিবার ছুয়ামাইয়া—কেহ থাকবে নাই—কথাটা গঅর করে বুঝেন তুমরা। খালি ঐ আল্লা ডাকটা! তুফান হউক দেওয়া নামুক, বানবরিষা হউক—আল্লা ডাকটা ডাকেন ঈমানের সঙ্গে আল্লা পানাহ্ দিবে, সাফায়েত দেনে অলা তো আল্লা ছাড়া কেহ নহে।

হাজী মহাজন তারপর উঠে চলে গিয়েছেন বাড়ীর ভেতরে। আর আধিয়ার কিষাণেরাও একে একে নিজ নিজ বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। সবারই মন ভাবগ্রস্ত—হায় জীবন কী অনিত্য, কী ক্ষণস্থায়ী মানুষের সুখ আর বেদনা—যে পরিবারের জন্য এতো ভাবনা হয় সে তো মোর কেহ নহে! আর পুত্র—পুত্রই কি আমার কেউ নাকি? কেউ তো আমাকে চিনতে পারবে না শেষ বিচারের দিনে। তাহলে? কী লাভ অস্থির হয়ে—এই চাষবাস সংসার পালন—কী লাভ এ সবে?

নসরদ্দিনের সমস্ত মনে হাজী মহাজনের আবেগটি যেন বা সঞ্চারিত হয়েছিলো। ভারী উদাস হয়ে গিয়েছিলো সে। তারপর ঘাটে এসে দিবাবসান দেখছে সামনে। বন্যা এবং দিবাবসান, ভারী অদ্ভুত যোজনা। শিবদাস বাবাজির গানটিও সেই সঙ্গে মেলানো—আহা দিন গেলো সন্ধ্যা হইল ইবার হবি ভবনদী পার।

নসরদ্দিন ঘাটে এসে ভবনদী নয়, টাঙন নদী দেখে। দেখে ধারণা হয়—ভবনদী বুঝিবা এই রকমই উত্তাল বুঝিবা এইরকমই বিশাল। ভবনদী এবং টাঙন নদী একাকার হয়ে বয়ে যেতে থাকে তার চোখের সামনে।

হ্যাঁ, বন্যায় উত্তাল টাঙন নদীর ঘোলা পানি পাক খেয়ে খেয়ে কেমন তীব্র স্রোতে বয়ে যাচ্ছে তাই দেখতে পায় সে। বাঁয়ে বিস্তৃত জলরাশি কেবলি চকচক করছে—কিন্তু ডাইনে দেখো ভিন্ন দৃশ্য। সেদিকে গামারডাঙার মাঠ, সেই মাঠের ভেতরে উঁচু দুই পাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকেছে সেই বিস্তৃত জল স্রোত। জলস্রোত এবং কঠিন মাটির মধ্যে তুমুল লড়াই হচ্ছে সেখানে বোঝা যায়। থেকে থেকেই নদীর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন গোঁ গোঁ করে উঠছে। নদীর স্রোতের মাথায় শাদা ফেনা ভাসতে ভাসতে ছুটে যাচ্ছে—দূর থেকেও নজরে আসে, পানির রঙ ঐখানে দারুণ সর্পিল।

এই নদীও কী রকম বিষাদ বিস্তীর্ণ করে দেয় দেখো। নদীও অনিত্যতার কথাই যেন ঘুরে ফিরে প্রকট করে। আহা একদিকে গঠন আর অন্যদিকে বিনাশ—একই লীলা দয়াময়ের। একদিকে নদীর পানি বিস্তৃততর হয়, ফুলে ওঠে আর অন্যদিকে তা-ই সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবল ঘুর্ণি সৃষ্টি করে, মাটি কেটে, পাড় ভেঙে জীবনকে দলিত মথিত করে কেমন বহে যায়। একদিকে যদি জীবন, তো অন্যদিকে মরণ।

নদীর এই রূপ নসরদ্দিনকে আরো উদাস করে দেয়। শিবদাস ঠাকুরের গানখানি সে এবার সুর ধরে গুনগুন করে গাইতে আরম্ভ করে—দিন গেলো সন্ধ্যা হইল, ইবার হবি ভবনদী পার।

ঐ ভবনদী পার হওয়াটুকুই নিশ্চিত। আর কিছু নয়। সবকিছু চলে যায়, ভেসে যায়। তার মেয়েটা রোগকাতর, স্ত্রী কঙ্কালসার—বুকে দুধ আসে না, স্তনদুটি যেন শুকনো কাঁঠাল পাতা, একটি গরুর খুরে পোকা কিলবিল করছে—হাটে ফিনাইল মেলে না; ঘরের খুঁটি দুটি নড়বড়ে কখন যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে বলা যায় না—এসব কথা একেকসময় মনে আসে, কিন্তু স্থায়ী হয় না। ক্ষোভ কিম্বা বেদনা কিম্বা ক্রোধ—কিছুরই সৃষ্টি করে না—ঘুরে ফিরে কেবলি অনিত্য জীবনের প্রবাহটিকেই সে অনুভব করে, ঘুরে ফিরে কেবল ঐ ভাবটি—ঐ গান—ভবনদী পার হবার গানটিই মনে গুনগুন করে ফিরতে থাকে। কিছুই যাবে না সঙ্গে, হায় ভবনদী পার হবার সময় কেউ সঙ্গে থাকে না, কেউ কাছে থাকে না।

সংসারের জন্য কে কী করতে পারে বলো? সংসারও তো নদীরই মতোন—সাধ বলো, বাসনা বলো, সুখ বলো দুঃখ বলো—সবই তো বহে যায়। মেয়েটা আটাগোলা খেয়ে খেয়ে আমাশায় কঙ্কালসার, স্ত্রীর কোলে সন্তান আসে কিন্তু থাকে না কেউ, চলে যায়—এমনি করে সাতটি গেলো—কিন্তু তবু আসার বিরাম নাই। মহাজনের বীজধান দেবার কথা, একেবারে হলপ করা কথা—আধিয়ার কিষাণরা সকাল থেকে বসে থাকলো কিন্তু মহাজন আসতে পারলো না শহর থেকে। বলো কার কি করার আছে? সংসার তো এরকমই, জীবন তো এরকমই।

দেখো, নদী কেমন চর তুললো ভাঁটিতে। সেই চরে দশ বছর পর মহাজন আবাদ বসালো—আর ওদিকে তখন নদী আরেকটা পাড়া ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেলো—একপাল আধিয়ার কিষাণের ঘর বাড়ি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেলো।

বলো, কার কি করার আছে ? জীবন যদি এরকমই না হয় তাহলে কি এসব ঘটনা ঘটে ?

নসরদ্দিন ঘোলা জল দেখে। দেখে, ঘরের চালের একগোছা খড় ভাসমান দুটি একটি ইতস্তত: বটপাতা, কিছু কচুরীপানার শাখা—সব কেমন উল্টো দিকে ভেসে যাচ্ছে। প্রবল স্রোত সঙ্কীর্ণমুখে পড়লে এরকম হয়—কিছু পানি বিপরীত স্রোতে যায়।

জলস্রোতের এই ভিন্নমুখী আচরণেও শিবদাস ঠাকুরের গানটির তাৎপর্য সে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় এবার—হ্যাঁ, সবই বহে যায়, কখনো সামনে কখনো পেছনে,—কখনো বেগে, কখনো ধীরে—কিন্তু বহে যাবে ঠিকই। তুমার কান্নার জন্য, সাধের জন্য — লাভের জন্য কি ক্ষতির জন্য থামবে নাই কুনো স’ম।

নসরদ্দিন এই সময়, এই উদাস বিষাদময় মুহূর্তটিতে দিগন্তের দিকে চোখ তোলে এবং পুনরায় দিবাবসান দেখে। ঐ দেখতে দেখতেই সে গলা ছেড়ে গানটা গেয়ে ওঠে। গভীর বিষাদের সেই গান, আত্মনিবেদনের সেই হৃদয়মথিত সুর গলায় ঠিক মতো ফোটে না—কিন্তু তবু নসরদ্দিন গায় গানটা। আর ঐ গানের জন্যে কি না কে জানে, নদীর পরপারে ঘাটোয়ালের ঘর থেকে দিবোদাস মাঝি চিৎকার করে ডাকে, কে বাহে, নসরদ্দিন ?

নসরদ্দিন গান থামিয়ে চিৎকার করে জানান দেয়, হাঁ বাহে হামরা কি এইপারই থাকনো, নাও কি এইপার আসবে নাই ?

দিবোদাস কিছু বলে হয়তো বা হাত নেড়ে, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না।

নসরদ্দিন নদীর ওপার থেকেই দেখতে পায় দিবোদাস মাঝি নৌকোর পরিচর্যায় নেমেছে। নৌকো নয় ঠিক, দুটি নৌকো একত্রে জুড়ে ফেরী বানানো হয়েছে। ফেরী নৌকোটি এখন কাছি দিয়ে বটগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা। ফেরীটি কখনো ডাইনে যাচ্ছে, কখনো বাঁয়ে। নৌকোর কালো পেটে যুগল-মকর আঁকা। কালোর ওপর শাদা রঙের মকর বাহিনী গঙ্গার ছবি আঁকতে চেয়েছিলো কেউ। কিন্তু অসমাপ্ত গঙ্গা মূর্তিটি নজরে আসে না—শুধু ঊর্ধ্বপুচ্ছ মকরযুগলের ছবিটিই দেখা যায়।

একেকসময় মনে হয় মকরযুগল নদীর স্রোতে কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে সাঁতার কাটছে। দিবোদাস মাঝি মকরবাহিনী গঙ্গার কাহিনীটি শুনিয়েছিলো একদিন—নসরদ্দিনের পুরো বিবরণ এখন মনে নেই। তবে অস্পষ্ট মনে আছে

কোন এক রাজার সহস্রপুত্রের ভস্ম হওয়ার এবং পুনরায় বেঁচে ওঠার একটি ব্যাপার আছে ঐ কাহিনীর মধ্যে।

নসরদ্দিন মকরযুগলকে লক্ষ্য করে দেখতে থাকে এবং গুনগুন করে গানটি গাইতে গাইতে অপেক্ষা করতে থাকে। না অস্থিরতা নেই তার। অস্থির হয়ে তো লাভ হয় না কখনো। সূর্য এখন দিগন্তের বনরাজিনীলা ছুঁয়েছে। সারা আকাশে বিচিত্র রঙ এখন। প্লাবিত মাঠে ঐ সিন্দুরবর্ণের আভা ভয়ানক লাগে দেখতে।

আর এইসময় হঠাৎ টের পায় কে একজন পানিতে শব্দ তুলে হেঁটে আসছে ঘাটের দিকে। মুখ ফেরালে চিনতে পারে—দিবোদাস মাঝির নফর—সুবলচন্দ্র। সুবলচন্দ্র হাসে, কী বাহে, বীচনের ধান পান নাই?

নসরদ্দিন গুনগুন করতে করতে মাথা নাড়ায়। সুবলচন্দ্র বড়ই কৃশ,কণ্ঠা এবং পঞ্জরাস্থিগুলি প্রকট। তার কোমরের বস্ত্রখণ্ড নিম্নোদরে স্ফীতির আভাস দেয় মাত্র—তাতে গিঁটবাঁধা কাছির মতো তার অবয়বটি প্রতীয়মান হয়।

নসরদ্দিন শুধায়, হ্যাঁ বাহে নাও কি ইপার আসবে নাই?

নফরটি তরুণ তায় রসিক। পাল্টা শুধায়, ক্যানে বাহে, উপারের মানুষ ইপার আসে ক্যানে? ইপার আসার দরকারটা কি?

নসরদ্দিনের মনে পড়লো ছোকড়ার মনিব দিবোদাস ঘনঘন এপারে আসে হরিদাসী বোষ্টমীর লোভে। মনিব কাছে নেই বলেই ছোকড়ার এই মস্করা। নসরদ্দিন তখন ঐ প্রসঙ্গ আনতে চায়। বলে, সবার কপাল কি একরকম বাহে? কেহ আসে পীরিতের জ্বালায় আর কেহ আসে পেটের জ্বালায়।

কি, কি কহিলেন? সুবলচন্দ্র শুনতে পায় না ঠিক।

পেটের জ্বালায় বাহে, পেটের জ্বালায় ইপার আসে।

হাঁ বাহে পেটের জ্বালায়—সুবলচন্দ্রের পঞ্জরাস্থি ও কণ্ঠার খাঁচা থেকে দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয় একটি। বলে, হাঁ বাহে পেটের বড় জ্বালা, ইপার উপার যাই আসি কতোবার কিন্তুক এই পেটের জ্বালাটা তো মিটে না।

আর ঐ সময়, পেটের জ্বালা সংক্রান্ত কথাগুলি বলবার সময় ক্ষুদ্রাকৃতি ঘুণ্টির ঝুনঝুন শব্দ ভেসে আসে।

নদীর পরপারে সরকারী সড়ক যেখানে অর্ধবৃত্তাকারে ঘাটমুখী হয়েছে সেদিকে তাকায় দুজনে।

মাহাজনের গাড়ী বাহে—সুবলচন্দ্র জানায়।

সুবলচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে কিছুটা স্বস্তির ভাব প্রকাশ পায়। কেননা ঐ গাড়ি নিয়ে ফেরীনৌকাটির এপারে আসতে আর দেরী হবে না।

সুবলচন্দ্রের স্বস্তি, কিন্তু নসরদ্দিনের মগজে নতুন চিন্তার উদয় হয়। ভাবে, মহাজনের সঙ্গেই সে আবার ফিরে যাবে কি না। ফিরে গিয়ে বীজ ধানের আরজিটা নতুন করে পেশ করবে কি না।

সে অবশ্যি বোঝে, মহাজনের মানসিক অবস্থা এখন ভিন্ন প্রকার থাকবে। কেননা দীর্ঘকাল পরে ছেলেমেয়েরা ছুটিতে বাড়ি আসছে, সঙ্গে মহাজনের বড় পরিবারটিও সম্ভবতঃ আছেন। সুতরাং আনন্দ কোলাহলের মাঝখানে বীজধানের প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই মহাজনকে প্রসন্ন করে তুলবে না।

মহাজনের ভারী সুখী জীবন। বড় পরিবারটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে শহরে থাকেন, ছোটটি গাঁয়ে। মহাজনের সঙ্গে এখন সবাই একত্র হবেন—আহা একত্র হওয়া কী আমোদের। মহাজনের সন্তান কটি ভারী উজ্জ্বল, মেয়েটিই বড়। না জানি মেয়েটি কত বড় হয়েছে। নসরদ্দিন বড় মেয়েটির মুখের চেহারা স্মরণে আনতে চেষ্টা করে। তিন বছর আগে একবার দেখেছিলো—আহা মেয়েটির মুখশ্রী বড়ই মায়াময়। আর মহাজনের বড় পরিবার? বহুকাল আগে দেখেছিলো একবার নসরদ্দিন—মহাজনের দ্বিতীয় বিবাহ-যাত্রার প্রাক্কালে। বড়লোকের বউয়ের গায়ের রঙ ভারী মসৃণ হয়—ঐদিন প্রথম বুঝেছিলো সে। তখন তাঁর হুশজ্ঞান ছিলো না—কপালে মাথা ঠুকছিলেন এবং ছুটে গিয়েছিলেন কুয়োতে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে। ঐ দিনই দেখেছিলো নসরদ্দিন বড়লোকের বউদের শরীরে প্রচুর মাংস থাকে বক্ষদেশ থাকে ভারী উন্নত, নিতম্বে থাকে অসাধারণ পুষ্টি। আলুলায়িত-কেশ বড় মহাজনের পরিবারের আকুল কান্না তখন মর্মবিদারক মনে হয়নি। আর দশজন কিষাণের মতো নসরদ্দিনও ঐ মজার দৃশ্য উপভোগ করেছিলো সেদিন।

ছোট পরিবারটিকে অবিশ্যি দেখা যায় না। তবে শুনেছে ঐ মেয়েমানুষটি আরো আকর্ষণীয়া।

নসরদ্দিন ঘুরে ফিরে মহাজনের স্ত্রী-পুত্র এবং সুখের সংসারের কথা ভাবলো। ভারী সুখী বড় মহাজন—খোদাতালার ইচ্ছায় তাঁর কোনো কষ্ট নেই। আম্বিয়ার কিষাণের কষ্ট হয়, কিন্তু মহাজনের দেখো কষ্ট নাই। খরা হোক, বানবন্যা হোক, রোগব্যারাম হোক—মহাজন কেমন অটল। কান্দে না, ঘাবড়ায় না, হায় হায় করে না। ভারী শক্ত পায় দাঁড়িয়ে থাকে রাজার মতোন। আর তাঁর ছেলেমেয়েরা। আহা তাদের চোখে দেখলেও সুখ।

মহাজনের গাড়ি এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চারদিকে বানের পানি, ঐ পানিতে আকাশের সিন্দুর রঙ, ঐ রঙের উপরে উঁচু সড়কটি, আবার তার উপরে মহাজনের গাড়ি ছুটে আসছে। এই জীবন্ত চিত্রটি মুহূর্তে সমস্ত চরাচরে ভারী রহস্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করে যায়। এমনকি দিবাবসানের ম্লান আলোতেও গাড়োয়ানের মাথায় বাঁধা নতুন গামছার লাল রঙটি অত্যধিক ঝকঝক করে।

নসরদ্দিন ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে একটি শব্দ শুনতে পায়—ডাইনে কিছুটা ভাটিতে, প্রকাণ্ড পাড় ধ্বসে পড়লো কোথায়।

ঐ নধর বৃষযুগল, মাথায় গামছা বাঁধা গাড়োয়ান, সুদৃশ্য গোযানের স্বচ্ছন্দ আগমন. চারদিকের জলরাশি, আসমানে সিন্দুর বর্ণচ্ছটার আভা এবং সেই সঙ্গে মহাজনের সুখী জীবন সম্পর্কিত ভাবনাদির উপর এসে পড়লো যেন ঐ ভয়ানক শব্দটা। শব্দটা তীক্ষ্ণ নয়,—জলরাশিতে বস্তু যেমন ডুবে যায় ঐরকম শব্দটাও যেন ডুবে গেলো। কিন্তু ঐ ডুবে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় শব্দটির মধ্যে যেন বা অসহায় বিপন্ন একটা আর্তনাদ ছিলো কোথাও। আর ঐ বিপন্ন অথচ নিমজ্জমান শব্দ নসরদ্দিনকে নিমেষে সচকিত করে দিলো। তখন বিষাদ নয়—বোধহয় ঈষৎ আশঙ্কা জাগলো। গান নয়, বুকের ভেতর থেকে যেন সরব চিৎকার উঠে আসতে চাইলো।

অথচ এসবই অহেতুক—ক্ষণিকের ব্যাপার সব। পাড় ধ্বসে পড়ার শব্দ, ঐ শব্দের প্রক্রিয়ায় আর্তনাদ এবং আবার ঐ আর্তনাদে সচকিত হয়ে ওঠা—এসবই মুহূর্তের ব্যাপার বৈ অন্য কিছু নয়। তাই নসরদ্দিন পুনরায় মাঝিকে দেখে, দেখে গরু দুটি অবলীলায় গাড়িখানা টেনে নিয়ে এসেছে ফেরী নৌকোর ওপর। ইতিমধ্যে গরু দুটিকে জোয়াল থেকে খুলেও নেয়া হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এসেছে মহাজনের মেয়েটি। আহা মেয়েটি অপরূপ হয়েছে দেখতে—তার উডডীন আঁচলে রকমারি নক্সা। বাতাসের দাপটে দেহলতাটির বক্ষদেশে কোমল এবং স্নেহময় স্তনযুগলের আভাস নজরে আসে। হায় নসরদ্দিনেরও ঐ বয়সী একটি মেয়ে ছিলো। আর মহাজনের ছেলে দুটি? আহা চোখ ফেরানো যায় না। কী উজ্জ্বল, কী বা তাদের বেশভূষা। দেখে বিশ্বাস হয়—ভবিষ্যতে ওরা নিশ্চয়ই রাজা হবে। মহাজনের পোষাক সাহেবী—উর্ধ্বমুখী হয়ে তিনি সিগারেটের ধূম্রপান করছেন।

নদীর শোভা, বিশেষতঃ বন্যাপ্লাবিত নদীর শোভা দেখে শহরবাসী ছেলে-মেয়েরা মোহিত হয়ে যায়। ছোট ছেলেটি ঘন ঘন ফেরীর প্রান্তদেশে এসে

দাঁড়ায় এবং রঙীন কাগজের মোড়ক ছুঁড়ে দেয় পানিতে। রঙীন কাগজগুলি ফুলের মতো ভেসে চলে যায়। ছেলেটির তাতে নিরতিশয় খুশি। সমানে হাততালি দিতে থাকে।

নসরদ্দিন সমস্ত ছবিটা ভারী মনোযোগ দিয়ে দেখে। হ্যাঁ, ছবিই তো। ভারী সুখের ছবি, ভারী শান্তির ছবি। চিন্তাহীন মহাজন—আর তাঁর স্থূলাঙ্গী স্ত্রী বড়ই মর্যাদাময়ী। মেয়েটি শান্ত, তবে যৌবনের কারণে বা ঈষৎ চঞ্চলও হতে পারে। বাতাস তাকে ক্রমাগত বিব্রত করে চলেছে। কোমল স্তন দুটিকে সে রেশমী শাড়ির আঁচল দিয়ে আব্রুতে রাখতে পারে না। আর ছেলে দুটি দেখো কী স্বাস্থ্যময় উজ্জ্বল! এই পরিপূর্ণতার ছবিটি ভারী মধুর লাগে নসরদ্দিনের। ওদিকে ফেরী নৌকোটি এগিয়ে আসে। দিবোদাস আর তার সাথী মাঝিটি লম্বা লম্বা লগি ওঠায় এবং নামায়—এবং ধীরগতিতে নৌকোটিকে এগিয়ে নিয়ে আসে। নৌকোর কালো পেটে আঁকা মকর যুগল জলরাশিতে যেন বা পরম উল্লাসে সাঁতার কাটে।

হ্যাঁ, ভারী অদ্ভুত যোজনা এখানেও—বন্যাপ্লাবিত নদীর জলস্রোত, জলস্রোতে উপরে ফেরী নৌকোটি, ঐ নৌকোর উপরে আবার মহাজন এবং তাঁর সংসার—ঐ সংসারের উপরে আবার দেখো সুখ কেমন ভাসমান।

জীবন কি এইরকম? দিবাবসানের ম্লান আলোতে ভাসমান ছবিটি দেখতে দেখতে নসরদ্দিন নিজেকে প্রশ্ন করে। জীবনে সুখ কি এইরকম ভাসমান থাকে? এই সুখ কি সবার সংসারে আসে কখনো? পরিপূর্ণতার এইরকম সুখ? নদীস্রোতে ভাসমান মহাজনের সুখের সংসারের ছবিটি একসময় ভারী অলৌকিক বোধ হয় নসরদ্দিনের কাছে।

নৌকো তখন ঘাট থেকে দূরে চলে যায় কিছুটা, কিছুটা ভাটিতে সরে। আর দিবোদাস মাঝির গলা শোনা যায় তখন, হুঁশিয়ার, সামাল বাহে। ঐ সাবধান বাণীতে বোধহয় কোনোরকম বিচলিত ভাব ছিলো। সঙ্গী মাঝিটি তখন নৌকো উজানে ঠেলবার জন্যে লগিতে প্রাণপণ চাপ দেয় এবং ঐ সময়ই অঘটনটি ঘটে। বাঁশের ঐ লগিটি, কে জানে কেন, মাঝখানে মটাৎ করে ভেঙে যায়।

আর ত্বরিতে ফেরী নৌকোটি যেন গতি পায়। পুনরায় নতুন লগি নামিয়ে ঠেলতে চেষ্টা করেও আর পারা যায় না। নৌকো তখন ভাটিতে নামছে। আর ঐসময় দিবোদাস চিৎকার করতে থাকে। গরু দুটির একটি লাফিয়ে পড়ে পানিতে, পানিতে পড়ে যে কোথায় যায় আর দেখা যায় না। মহাজনও সম্ভবতঃ চিৎকার করছেন— কিন্তু সে চিৎকার শোনা যায় না।

নসরদ্দিনও তখন ছুটছে পাড় ধরে। সুবলচন্দ্র পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে, সাঁতরে উঠেছে নৌকোর ওপর। নৌকো থেকে সে আবার বাঁধা দুটি কাছি নিয়ে সাঁতরে এসে উঠেছে ডাঙায়। একটি কাছির মাথা নসরদ্দিনের হাতে দিয়ে আরেকটি নিয়ে সে স্রোতের উজানে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন আর অন্য চেষ্টা নয়—নৌকোটিকে শুধু পাড়ের কাছে রাখা। মাঝনদীর স্রোতে গিয়ে যেন না পড়ে—শুধু এই চেষ্টা। নৌকো যদি ভাটিতে যায় তাহলেও আপত্তি নেই।

নসরদ্দিন জীবনে প্রথম বুঝতে পারে জলস্রোতের উজানে যাওয়া কী কঠিন কাজ! সে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাছি টানে—কিন্তু হায়, নৌকো উজায় না এক-চুলও—কেবলি পাড় থেকে সরে যেতে চায়! কেবলি টেনে নিয়ে যায় স্রোতের দিকে।

নৌকো তখন অনেক ভাটিতে চলে এসেছে। গামাব ডাঙার উচু পাড়ে পৌঁছেছে নসরদ্দিন আর সুবলচন্দ্র। দিবোদাস চিৎকার করে তখন—প্যাঁচাও গাছের গুড়ির সঙ্গে. প্যাঁচাও রশিটা। নসরদ্দিন গামার গাছের গুঁড়িটা দেখতে পায় অদূরে। কয়েক পা এগিয়েও যায় গুঁড়ি লক্ষ্য করে। তার পর পেছন ফিরে তাকায়। নৌকার দিকে।

আহা সন্ধ্যাকাশের দৃশ্য কী মনোহর। উত্তাল জলস্রোত ফেরী নৌকোটিকে টানছে - দুপাশে জলস্রোতে ও মাটিতে তুমুল লড়াই—আর আকাশের মেঘে সিন্দুর বর্ণ ভয়ানক হয়ে উঠছে। এবং ঐ বর্ণচ্ছটা চরাচরে বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সূর্য বুঝিবা অস্তগত। সংসারের কত দুঃখ—হায় আমার বউয়ের বুকে দুধ নাই গো। মেয়েটা ভয়ানক কান্দে—কিন্তু দিন কেমন অবসান হয়ে যায় দেখো। দিন কেবলি ফুরিয়ে যায়। দিন থাকে না কখনো।

কেউ কেউ চিৎকার করে হয়তো, হয়তো ভয়ার্ত কান্নারোল ওঠে। নসরদ্দিনের হাতের কাছিটি পড়ে যায়—গামার গাছের গুঁড়িতে আর পেঁচিয়ে দেওয়া হয় না—কাছিটি ক্রমে ক্রমে সরে যেতে থাকে। না, নসরদ্দিনের ইচ্ছে হয় না কাছিটি তুলে আনতে। গভীর বিষাদ একাকার হয়ে যায় তার বুকের ভেতরে।

শিবদাস ঠাকুরের গানটি, ঐ ভবনদীর গানটি তখন সে ভারী স্পষ্ট শুনতে পায়। মন্দিরার মধুর আওয়াজটুকু পর্যন্ত কানে আসে। ঘূর্ণিতে পাক খাওয়া বিপন্ন ফেরী নৌকোটি তখন দেখা যায় না আর। দিবাবসানের ম্লান আলোয় নৌকোটির নিমজ্জন প্রক্রিয়ার শেষ হাহাকারটুকু শুধু তার কানে আসে।

নয়নতারা কোথায় রে

আসমানে মেঘ ছিলো, কিন্তু বাতাসে তখনো বৃষ্টি ফোটেনি। চরাচরে অন্ধকার ছিলো ঘোলাটে পানির মতো। কান্দরের হাঁটুসমান কাশবনে বাতাস বইছিল না — একটা থমকানো ভাব সেই সন্ধ্যা থেকে কান্দর গ্রাম বন সবকিছুর উপর ঝুঁকে ছিলো। ওদিকে লম্বা টানা সরকারী রাস্তাটা শুয়ে ছিলো চুপচাপ। তার ওপারে কান্দর, তার ওপারে আবার জঙ্গল।

কিন্তু এখন দেখা যায় না কিছু। নজর কেবলি ধোঁয়াটে অন্ধকারে মিশে যেতে চায়। চোখ তীক্ষ্ন করে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে আছে—কিন্তু নজরে আসে না কিছুই। নজরে আসে না, কিন্তু ডাকটা শুনেছে সে। বহু দূরাগত বিপন্ন ভেঙ্গে-পড়া গলার একটা স্বর ঐ কান্দরের দিক থেকেই বেরিয়ে এসেছে। একবার শুনলে কথা ছিলো। ডাকটা সে কয়েকবার শুনেছে। প্রথম শুনেছে যখন গরু দুটোর মুখের কাছে ঘাস এগিয়ে দিচ্ছিলো তখন। ঘাস দিয়ে উঠে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে তখন শুনতে পায় দ্বিতীয়বার। তারপর এগিয়ে এসেছে সরকারী সড়কের দিকে—আসতে আসতে আরো দুবার শুনেছে। প্রথমে মনে হয়েছিলো বড় সড়কের ওপর থেকে ডাকছে কেউ। তারপর মনে হয়েছে কান্দরের দিক থেকে ডাকটা আসছে। শেষে মনে হলো, না —আরো দূর থেকে কেউ ডাকছে তাকে। গলায় ভয় নক নিঃস্বতা লোকটার। বিপুল একটা হাহাকারের ভাব সেই ডাকের মধ্যে। মনে হয়, ছেলেপুলে মরে গেলে বাপ যেমন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে সেইরকম একটা অসহায় এবং নিঃস্ব কান্না আছে ঐ গলার স্বরে। সে ভেবে পাচ্ছিলো না, কে হতে পারে লোকটা। গলার স্বরে সে চিনতে পারছিলো না —কিন্তু একেবারে যে অচেনা তা-ও সে বলতে পারে না। ইদিকে নিজের নামটা স্পষ্ট শুনেছে সে। তাহলে কার গলা শুনলো সে? প্রতিবেশীদের মধ্যে কি কেউ? নাকি আত্মীয়-স্বজনদের কেউ—ভয়ানক বিপদে পড়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে করতে কান্দরের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে। এই রকম ভাবতে ভাবতে সে বড় সড়কের ওপর থেকে ওপারের ঢালুতে নামতে যাবে, ঐসময় আর একবার ডাকটা শুনলো —এবারে একেবারে স্পষ্ট—কলিম দাদা, কলিম দাদা গে—

শুধু নামটা, আর কিছু নয়। শুধুই নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে লোকটা। অন্য কোনো কথা নেই তার। কলিমউদ্দিন আসমানের দিকে তাকালো একবার। সামনে, পেছনে, যেন ক্রমেই কালো হচ্ছে। এবারে চেপে বৃষ্টি নামবে বোধ হয়। ডাইনে তাকালো একবার—মহাজন বাড়ির দিক থেকে কাউকে আসতে দেখা যায় কি না। অনুমান করতে চেষ্টা করলো, রাত কি খুব বেশী হয়ে গেছে? মহাজন বাড়ির লোকজন চুপচাপ কেন? পরক্ষণে মনে পড়লো. ছোট মহাজনকে সে কবিরাজের হাটে যেতে দেখেছে।

চৌধুরীরা হাটে গেলে এমনিতেই বাড়ির চেহারা বদলে যায়। বাড়ির গমগমানো ভাবটা আর থাকে না—লোকজন বাড়িঘরসুদ্ধু সব কেমন যেন ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। ছোট মহাজন ফিরতে ফিরতে মাঝরাত—ওদিকে বড় মহাজন সেই যে গত মাসে চিকিৎসার জন্যে শহরে গেছে আর ফেরেনি। চৌধুরী বাড়ির দিক থেকে বিপন্ন মানুষের চিৎকারে যদি সাড়াশব্দ না আসে তাহলে অন্য কোনো দিক থেকেই বা সাড়াশব্দ আসবে কেন? রাতের অন্ধকারে এই রকম চিৎকারে যে-ভয় আছে সে-ভয় কাটিয়ে উঠবার মতো দু:সাহস গাঁয়ের মানুষের নেই।

ইদিকে আসমানের ভাবখানা দেখো। মেঘ ঝুঁকে রয়েছে তো রয়েইছে—বাতাস নেই—তার মানে টানা বৃষ্টি নামবে। কখন নামবে সেটাই এখন দেখবার বিষয়। কলিমউদ্দিন দেখলো, চারিদিকের ঘোলাটে ভাবটা ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে—কালো হয়ে আসছে অন্ধকার।

ঐভাবে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে, আসমানে মেঘের লীলা দেখতে দেখতে, বারেক তার চোখ সামনে প্রসারিত কান্দরের দিকে পড়লো আর তখনই সে দেখতে পেলো। অস্পষ্ট, কিন্তু দেখলো ঠিক। একটা মানুষ কাশবনের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে, রাতের অন্ধকারে যেমন দেখা যায়—তেমনি ছায়ার মতোই লোকটা প্রায় টলতে টলতে ছুটে আসছে। লোকটাকে দেখতে পেয়েই সে চিৎকার করে উঠলো, কে বাহে, কে ঐঠে?

দাদা—দাদা গে!

স্খলিত আর্ত চিৎকারটা বিচিত্রভাবে ভেঙে ভেঙে গেলো।

কে, কে তুই?

লোকটা মনে হলো হুঁচোট খেয়ে মাটিতে পড়লো একবার, তারপর আবার উঠলো। উঠে আবার চিৎকার করলো, দাদা—কলিম দাদা মোর নয়নতারা গে—

সেই মুহূর্তে শরীরের অত্যন্ত ভেতর থেকে একটা ঝাঁকুনি উঠে এসে কলিমউদ্দিনের পেশিতে পেশিতে ধাক্কার মতো এসে লাগলো। নয়নতারার কিছু হয়েছে তাহলে—এ মনোহর বর্মনের গলা। সে স্পষ্ট চিনলো। পাশের গাঁয়ের মনোহর বর্মন ঐভাবে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে আসছে। সে সামনের দিকে ছুটলো তখন।

আসমানের লীলা বোঝা ভার। এই বাতাস বন্ধ, গুমোট ভাব, যেন চেপে আসছে বুকের উপর ভারী বোঝার মতো—তারপর এই আবার দেখো, দেখতে দেখতে কোনদিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করে দিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ফুটে উঠলো বাতাসের গায়ে। শেষে মেঘ ডাক ছেড়ে বৃষ্টি ঢালতে শুরু করে দিলো। কোনো ঠিক নেই—বর্ষার আসমান—তবু কিছুই বলা যায় না।

লোকটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে। মনোহর বর্মনই, অন্য কেউ নয়। কলিমউদ্দিন মানুষটাকে টেনে তুলতে পারে না—এতো ভারী! জবাই করা জানোয়ারের মতো লোকটা কেবলি গড়াগড়ি খায়—মুই কি করমু দাদা, মোর নয়নতারাক্ ধরে লিয়ে গেল্। মোর মা জননীক্ মারে ফালাবে—মুই কি করমু, কহ তুই!

কলিমউদ্দিন বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকে তখন। কিছুই করতে পারে না। স্থির দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে। মনোহরের প্রকাণ্ড দেহের কাঠামোটা তার পায়ের কাছে পড়ে কাতরাচ্ছে—আসমানের দিকে মুখ করে কখনো, কখনো মাটিতে মুখ গুঁজে, কখনো চিৎকার করে, কখনো ধীরে মৃদু ফোঁপানির মতো, কেবলি সে বিলাপ করে চলেছে। আর থেকে থেকে পা দু'খানিকে সে মাটিতে আছড়াচ্ছে। কলিমউদ্দিনকে সেই দৃশ্য স্থির চোখে দেখতে হচ্ছে। কথা বেরুচ্ছে না তার মুখ দিয়ে—সান্ত্বনা না, সাহস না, ক্রোধ না, সহানুভূতি না। মানুষকে কি এই-ভাবেই পাথর হয়ে যেতে হয় একেক সময়?

সে ঠিক বুঝতে পারে না।

তবু ব্যাপারটা সে বুঝতে চেষ্টা করে। কেমন মনে হয় মানুষ যখন মার খায়—শুধুই মার খায়—তখন সম্ভবতঃ কারুরই কিছু করার থাকে না। যখন মানুষ দু'হাতে শক্তি পায় না, যখন মনের ভেতরে লড়াই করার ইচ্ছেটা দপদপ করে ওঠে না, তখন সম্ভবতঃ মনোহর বর্মনের মতোই হয়ে যেতে হয় মানুষকে। কলিমউদ্দিন ভারী স্থির নজরে দেখতে থাকে। গতকাল বিকেলেও কথা হয়েছে কতো। নয়নতারা বাটিতে মুড়ি এনে দিয়ে বলেছিলো, কাকা দুটা

মুড়ি খা। মেয়েটার কানের মাকড়ি ভয়ানক জ্বলজ্বল করছিলো বিকেলের রোদ লেগে! মা-মরা মেয়ের দিকে তাকিয়ে মনোহর সস্নেহ গলায় বলেছিলো, ইটা মোর মা লক্ষ্মী দাদা। কথাটা বলবার সময় তার ভঙ্গিতে সগর্ব একটা ভাব ফুটেছিলো। এখন দেখো, সেই মনোহরকে চেনা যায় না। না, কোনো কৌতূহল জাগে না তার, ঘটনার বিস্তারিত খবর জানবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করে না সে। শুধু স্থির নজর থেকে থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে, আবছা অন্ধকার ভেদ করে যেন লোকটাকে ছুঁতে চায়। কখনো তার নজর লোকটার ভাঁজ করা দু'হাতের ওপর রাখা এবং ডাইনে-বাঁয়ে হেলানো মাথার ওপর গিয়ে স্থির হতে চায়, কখনো ঘাড়ের শীর্ণ পেশিতে টানটান ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করে, কখনো আছড়ানো পা দুটোর উত্থান এবং পতন লক্ষ্য করে।

কিছুই করার নেই কারো—এইরকম একটা অসহায় অথচ উদাস ভাব তার মনের মধ্যে জেগে উঠছিলো। ঘটনাটা যেন অমোঘ ছিলো—এমন কথাও তার মনের মধ্যে কেউ যেন বলছিলো থেকে থেকে—হাঁ, মরণের মতোই, অমোঘ এবং অনিবার্য বলে একেকবার তার মনে হচ্ছিলো।

উদ্যত বন্দুকের নলের পেছনে যখন ডাকাতের মুখে হাসি ঝলসে ওঠে অহরহ তখন এরকম ঘটনা অনিবার্য ছাড়া আর কী? কলিমউদ্দিনের রাগ হচ্ছিলো মনোহরের ওপর। বলতে ইচ্ছে করছিলো, তোর বেটির অতো রূপ ক্যানে অাঁ? কহ, তুই অমন হিম্মত দেখাবা যাইস ক্যানে? কলিমউদ্দিনের এই রাগও আবার বিষাদে পরিণত হয়ে যাচ্ছিলো একেকবার। মানুষের জীবনের কথা মনে হচ্ছিলো তার। গত বছর আকাল এসে গেলো, এবছর আউশের আবাদটা হলো না—মানুষের কি কপাল দেখো। আসমান, কান্দর, জঙ্গল, ঘরবাড়ি—সব যেমনকার তেমনি রয়েছে কিন্তু এসে গেলো এই রকম একেকটা বিপর্যয়। মানুষের কিছুই করার থাকলো না। আসলে মরণ এমনি করেই মানুষের জীবনে চলে আসে। কারো কিছুই করবার থাকে না।

সম্ভবতঃ কলিমউদ্দিন মেঘচাপা আসমান তার নীচে বৃষ্টির আয়োজন এবং তারো নীচে আবার বিস্তৃত কান্দরটা দেখতে পাচ্ছিলো চোখের সামনে—আর সেই প্রকাণ্ড পটে মনোহরের গড়াগড়ি খাওয়া আর্ত হাহাকারটা কেমন মেলানো মনে হচ্ছিলো তার। বারবারই মনে হচ্ছিলো, মনোহর বর্মনের দুর্ভাগ্য এটা, দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কিম্বা এমনও হতে পারে—তার প্রৌঢ় বয়স, ভালোমন্দের হিসেব, শরীরের শিথিলতা এবং প্রায়-স্থবির মগজ তাকে বারবারই উদাস এবং গম্ভীর করে তুলছিলো।

কিন্তু স্মৃতি বড় ভয়ানক জিনিস। ঐরকম অবস্থাতেই স্মৃতি আবার তার শরীরের রক্তে কলকল করে জোয়ার আনছিলো। প্রৌঢ় পেশিতে টান লাগছিলো কোথায় এবং বারবার চোয়াল শক্ত হয়ে দাঁতের উপর দাঁত বসে যাচ্ছিলো।

মনোহর তোর না বড় সাহস? তুই না সেবার হাটের খাজনা দিস নাই? বড় মাহাজনের কথা তুই না মানিস নাই? তোর তানে না মহাজনের নফর চাকরের দল জোবেদালির ভিটা জবরদখল করিবা পারে না?

স্মৃতিতে নানান পুরনো কথা নাড়া খেয়ে উঠতে থাকে তখন। নাড়া খেয়ে উঠতে থাকে, কিন্তু ফেটে পড়ে না, চিৎকার হয় না। কেবলি ঘুরে ফিরে স্মৃতিতেই ফিরে যায় আবার।

কিষাণের একটা জীবনই কি কম, কহ? চৈত মাসের আগিনে হাড়িটোলা জ্বলে যাছে—আগিন নিভাবা কে যায় দেখো তো? দিবোদাসের বেটা মনোহর না? কালির মেলাত শহরের ছোঁড়াগুলা আসিছে, শালারা গাঁয়ের মা-বেটির গতরত্ হাত দিবা চাহাছে—ধর শালাক, মনোহর দা, হাত ভাঙ্গে দে শালার। রামবনবাসের গীতে রাবণ সাজবার লোক কই? কে বলবে হুঙ্কার দিয়ে:

ছাড় ছাড় পথ তোরে পাঠাব শমনে
চিন্হ না বেটা তুমি কিতাস্ত রাবণে।

পুরনো দিনের পুরনো কথা। কিন্তু দেখো কিষাণের একটা জীবনে কতো কথা থাকে। তেভাগার কথা মনে নাই বাহে?

কলিমউদ্দিন স্থির ছিলো। কতক্ষণ জানে না। কিন্তু স্থির দাঁড়িয়ে ছিলো সে। মনোহরের দাপাদাপিটা কমেছে। থেকে থেকে একেকবার সে হা হা করে উঠছে। তার ভাষা ফুটছে এখন সেই হাহাকারে। ফাঁকে ফাঁকে ঘটনাটার বিবরণ বর্ণনা করে যাচ্ছে সে। তার বিবরণের খুঁটিনাটি বর্ণনা কিছুক্ষণ শোনে কলিমউদ্দিন। কিন্তু বড় একঘেঁয়ে সেই বর্ণনা। নয়নতারা হাটে যেতে নিষেধ করেছিলো, নয়নতারা তার মাসীর বাড়ী যেতে চেয়েছিলো। হাটে যাবার আগে নয়নতারা চিঁড়েভাজা খেতে দিয়েছিলো বাপকে। হাট থেকে একখানা রূপবানের গানের বই কিনে আনতে বলেছিলো বাপকে। এইসব কথা একের

পর এক বিলাপের মধ্যে বলে যায় মনোহর। এইসব কথার মধ্যে যে কি আছে, কেন যে এইসব কথা বলে যাচ্ছে সে, কলিমউদ্দিন বুঝতে পারে না। এক সময় তার বিরক্ত লাগে। সে বলে, চুপ কর মনোহর, আর কহিস না উকথা। কিন্তু মনোহর থামে না। বলতেই থাকে, মোর নয়নতারা এমন বেটি নহে দাদা! একটা লোক মোর জননীক বাঁচাবা আসে নাই। মুখ ধরিবা গেলে হাতত কামড় দিছে, চ্যাঁচায় উঠিছে—কিন্তক কেহ আসে নাই দাদা—ওহ্ হো-হো মোর মা জননীক বাঁচাবার তানে একটা লোক আগায় নাই!

লোকটার ঐরকম আর্ত হাহাকার এবং বিলাপ সম্ভবতঃ গ্রামের আরো লোক শুনে থাকবে। একটিদুটি করে লোক দেখা গেলো একসময় বড় সড়কের ওপর। কৌতুহল না সমবেদনার কারণে তারা একে একে এসে পৌঁছাচ্ছিলো বোঝা মুশকিল। তবে লোকগুলো ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছিলো। আন্দোলিত হচ্ছিলো যে তার প্রমাণ তারা ক্রমেই কাছাকাছি জড়ো হচ্ছিলো এবং জড়ো হয়ে কাছে এগিয়ে আসছিলো। তারা কেউ কথা বলছিলো না—সম্ভবতঃ মনোহরের বিলাপ শুনছিলো এবং ঘটনাটা কি তা বোঝবার চেষ্টা করছিলো।

ঐ সময় বৃষ্টি শুরু হলো। মৃদু, ভারী ঝিরঝিরে, প্রায় বিন্দু বিন্দু, গায়ে লাগে কি লাগে না এই রকম। লোকগুলো প্রায় সবাই অর্ধোলঙ্গ। বস্ত্রহীন উর্ধ্বাংগ মৃদু বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো—কিন্তু চলে গেলো না কেউ, বরং কাছাকাছি এগিয়ে যেতে চাইলো কেউ কেউ। সড়কের ঢালে নেমে দাঁড়ালো কয়েকজন।

আর তখনই মনোহর বর্মন উঠে দাঁড়ালো। কেন যে, বোঝা দায়। সে উঠে দাঁড়ালে তার ঝাঁকড়া চুল, প্রায় উলঙ্গ লম্বা দেহাকৃতি ভৌতিক দেখাতে লাগলো। সবাই দেখলো লোকটা স্থির দাঁড়িয়ে নেই—কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, হেলছে দুলছে। এবং ঐ রকম ডাইনে-বাঁয়ে দোল খেতে খেতে তার ছায়ামূর্তি কলিমউদ্দিনের পাশে পাশে সড়কের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলো।

লোকটা সড়কের ওপর উঠে দাঁড়িয়েই থাকলো। কেন যে দাঁড়িয়ে থাকলো, বসলো না কিম্বা ক্লান্ত অবসিত দেহ গড়িয়ে পড়লো না, সেও এক রহস্য।

মনোহর বর্মনকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীদের জটলার মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠলো, তোর বেটি নয়নতারা নাই মনোরদা!

না রে ভাই—মোর নয়নতারা—মোর মা নাই—ধরে লিয়ে গেল্।

কে, কে লিয়ে গেল ?

কার প্রশ্ন কেউ জানে না। যার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে এসেছে সে নিজেও জানে না। এমনও হতে পারে প্রশ্নটা গ্রামবাসীদের মধ্যে আদৌ কেউ উচ্চারণ করতে চায়নি। কিন্তু তবু ঐ হঠাৎ বেরিয়ে-আসা প্রশ্নে সম্ভবতঃ যাদু ছিলো। প্রশ্নটা মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। কখনো সমস্বরে কখনো এককস্বরে। কে ধরে লিয়ে গেল্,কখ্খন ধরে লিয়ে গেল্ , কুনদিক লিয়ে গেল্, ক্যানে লিয়ে গেল্ ।

ঐ ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত প্রশ্নমালায় হঠাৎ ক্রোধ সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করলো। ক্রোধ বা আক্রোশের কোনো সম্ভাবনাই জাগবার কথা নয়। এর আগে অনেক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু এরকম প্রশ্ন করেনি কেউ। হতে পারে মেঘভারানত আসমান, আসমান থেকে ঝরে পড়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি এবং ঐসঙ্গে ঘোলাটে অন্ধকার—তাদের নিজ নিজ পরিচয় এবং মুখচ্ছবি ঢেকে দিয়েছিলো—কিম্বা এও হতে পারে যে একবার ভয় অথবা সঙ্কোচের বাধা ছিন্ন হলে বুকের ভেতরকার জ্বালা আপনা থেকেই উদগীরিত হতে থাকে। তাই অনায়াসে ঐ প্রশ্নমালা ক্রমান্বয়ে উচ্চারিত হতে থাকলো এবং উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ক্রোধও প্রকাশ পেতে থাকলো।

ঐ সময় কলিমউদ্দিনের গলা শোনা গেলো। সেই গলায় ক্রোধ আরো তীব্র, বিদ্রূপ আরো তীক্ষ্ম। সে প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নই করতে আরম্ভ করলো—কে লিয়ে গেল্ জানেন না তুমরা ? অ্যাঁ, জানেন না ? জানেন না, কারা এইসব কাম করে ?

আসলেই এইসব প্রশ্ন কিষাণের আদিপুরুষ থেকে রক্তের ভেতরে প্রোথিত হয়ে আছে। না হলে কিষাণ অমন আন্দোলিত হবে কেন ? কেন চকিতে ভয় ভুলে যাবে ? কেন এমনভাবে রক্তের মধ্যে জ্বালা অনুভব করতে আরম্ভ করবে ?

এর পরে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। কেউ ধানের কথা বলে, কেউ আকালের কথা বলে। মহাজনের নফর পাইকরা কী পরিমাণ শয়তান সেই প্রসঙ্গ আরম্ভ করে কেউ—আবার কেউ মহাজনের আশ্রিত বিদেশী দুই ছোকড়ার কথা বলতে থাকে। যেহেতু দরিদ্র কিষাণের চিন্তা প্রায়শ:ই স্বচ্ছ থাকে না, শৃঙ্খলার বিধানও তারা মানতে চায় না, সে কারণে ক্রমে ক্রমে ঐসব পুরাতন প্রসঙ্গগুলো বারবার পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। ফলে প্রায় মধ্যরাতে গ্রাম্য সড়কের মাঝখানে মানুষজনের জটলাটি একটি দারুণ শোরগোলের সৃষ্টি করে।

বৃষ্টি এখনো বিন্দু বিন্দু এবং ধীর। দক্ষিণ থেকে যে মৃদু বাতাস বইতে শুরু করেছিলো—এখন মনে হচ্ছে তা দিক বদল করলো। আসমানের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। মনে হচ্ছে কালো মেঘ বৃষ্টি ঢালছে দূরে কোথাও। আর ঐসময়, ঐরকম শোরগোলের মধ্যেও, গোরুর গলার ঘুন্টি শোনা গেলো। শুনতে পেলো সবাই, দূর থেকে এলেও এ শব্দ গ্রামবাসীদের এতোই চেনা যে অনুমানের দরকার পড়ে না। বোঝা গেল ছোট মহাজন এতোক্ষণে হাট থেকে ফিরছেন।

লোকগুলো এখন সড়কের চাল থেকে ওপরে উঠে এসেছে এবং প্রায় পুরো সড়কটাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ গালাগাল করছে এখন। ঐ গালাগালিতে একেকবার কৌতুকও এসে মিশতে লাগলো—ছোট মহাজনের বেটিক দেখিছেন—আহ্ হা কীরকম মটা হইছে—উশালা নিজের বেটিক দেয় না ক্যানে? খালি বেটি ক্যানে বাহে, মাউগটাক দিলেও তো পারে—

ঐ ঠাট্টা বিদ্রূপে, নাকি ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে. ঠিক বোঝা যায় না, এক সময় এতোক্ষণকার উত্তেজনার উত্তাপটা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে। নয়নতারা, কলিমউদ্দিন, মনোহর—এসব প্রসঙ্গ ভুলে যায় তারা। কেউ কেউ আফশোস করে গায়ের পিরানটা কেন চড়িয়ে নেয়নি আসবার সময়। কেউ ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করে, কেউ বা ছোট মহাজনের আশ্রিত বন্দুকধারীদের নিষ্ঠুরতার গল্প বলে। সব মিলিয়ে শোরগোলটা এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন একটা জটলার রূপ নিতে থাকে।

ছোট মহাজনের গাড়ির গরুজোড়া বড়ই সতেজ, তাদের চালে সুন্দর রাজকীয় ভঙ্গী। শুভ্র দেহ দূর থেকেও রাতের বেলা নজরে পড়ে, তদুপরি তাদের গলার ঘুনটির আওয়াজ, আহা কী মধুর!

শাজাহান চৌধুরী কবিরাজের হাট থেকে ফিরছেন তখন। হাটে থানার দারোগা, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী, তাঁর বন্ধু শ্যামাপ্রসাদ এবং ঐ রকম আরো কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় লোকের সঙ্গে আলাপে আলাপে তাঁর দেরী হয়ে যায়। তবু তিনি আগেই ফিরতে পারতেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি বেলায়েতকে দেখতে পান। সে কয়েকবারই কাছে এসে কথা বলবার জন্যে চেষ্টা করছিলো। দেখে তিনি ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিলেন। যখন তাঁর সময় হলো তখন আর বেলায়েতকে খুঁজে পেলেন না। আর সেজন্যেই তাঁর দেরী হলো।

ব্যাপারটা পুরো জানতে পারেননি। তবে কিছুটা আন্দাজ করেছেন। এবং তাঁর ম্যানেজার নেহালুদ্দিনও খোঁজ নিয়ে এসে যে খবর জানিয়েছে সেটাও তাঁর

আন্দাজকে সমর্থন করে। নেহালুদ্দিনের খবর, কোনো মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ঘটনা ঘটিয়েছে বেলায়েতরা। আর তাতেই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেন তিনি।

ঐ অস্বস্তিটুক বাদ দিলে অবশ্যি তাঁর সুখী থাকবার কথা। আপাতত: ধানের লেভীর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেছেন তিনি। সরকারী পাম্প আসছে একটি, সেটি যেন তাঁর মনোমত জায়গায় বসানো হয় সে ব্যবস্থাও হয়ে গেছে অতি সহজেই। বর্ডারে পাঠানো তিনটি ট্রাকের একটি আটক হয়েছিলো, সেটিকেও তিনি খালাস করতে পেরেছেন। সুতরাং তাঁর মনে উদ্বেগহীন একটা নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির ভাব ছিলো।

শুধু ঐ একটুখানি অস্বস্তি বেলায়েতরা আবার কোন অঘটন ঘটালো।

কিন্তু এ রকম অস্বস্তি নিয়েই তো জীবন। তিনি মোটের ওপর পরিতৃপ্ত বোধ করছিলেন। তদুপরি গরু দুটির ধীর চালে পথক্রমণ এবং সেই সঙ্গে তাদের গলার ঘুণ্টির মধুর আওয়াজ—মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছিলো তাঁর।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে নির্জন সড়কের ওপব একদল মানুষের শোরগোল শুনে তাঁর তন্দ্রা ছুটে গেলো। আমূল কেঁপেও উঠলেন বারেক। সঙ্গী নেহালুদ্দিন ঘুমোচ্ছিলো, তাকে ধাক্কা মেরে তুললেন।

আসলে প্রান্তর, নির্জনতা, অন্ধকার এবং সেই সঙ্গে আবার মেঘাচ্ছন্ন আসমান—এসব জিনিস একত্রিত হলে একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার হয়ে ওঠে। চেনা জিনিসই তখন হয়ে ওঠে ভীষণ অচেনা। ছোট মহাজনেরও সেই মুহূর্তে তাই মনে হচ্ছিলো। দেখলেন সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার, ফাঁকা ময়দান দুপাশে, আর সড়কের ওপর কোলাহলমুখর এক দঙ্গল মানুষ।

নেহালুদ্দিন ততক্ষণে বন্দুক বার করে লোড করে নিয়েছে।

গাড়োয়ানটিও দেখতে পায়—তারো বুদ্ধিতে কুলোয় না—সড়কের মাঝখানে এতো রাতে মানুষগুলোর ঐ রকম জড়ো হবার কারণ কি হতে পারে। সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে—যদি কোনো কথা বোঝা যায়।

শাজাহান চৌধুরী তখন বিচলিত বোধ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বার বার বলছেন, দেখো না নেহাল মিয়া, কি ব্যাপার।

নেহালুদ্দিন তখন বন্দুক আকাশের দিকে তাক করে। অনুমতি চায়, ফায়ার করবো ?

আর এও ভারী মজার কাণ্ড যে ঐ সময় গাড়োয়ান থাকা সত্ত্বেও, গরু দুটি, সেই উচ্ছৃঙ্খল রাজকীয় এবং দ্রুতগামী বৃষযুগল, বাধাহীন সচ্ছল গতি পায়।

তাদের থামাবার কথা কারো মগজেই তখন জাগে না। আর গরু দুটিও গলায় ঝোলানো ঘুণ্টিতে ঝুনুর ঝুনুর শব্দ তুলে ক্রমাগত সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে।

গাড়িটি ভিড়ের মধ্যে এসে পড়লে লোকজনের কোলাহল হঠাৎ থেমে যায়। কেন যে থেমে যায় এও এক রহস্য। শাজাহান চৌধুরী মানুষগুলোকে চিনতে পারেন এবং তাতে পরম স্বস্তি বোধ করেন। ভাবেন, কিছুই বলবেন না। বরং গোটা কাণ্ডটা উপেক্ষা করে সহজেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। যাচ্ছিলেনও—কিন্তু মূর্খ মনোহর বর্মনের ঐ সময় কী যে খেয়াল হলো—সে ভিড়ের মাঝখান থেকে এগিয়ে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

কে বাহে, কি চাহেন? শাজাহান চৌধুরী গম্ভীর এবং শান্তভাবেই কথাটা বলেন।

আর ঐ সময় মনোহর বর্মন ভাঙা ভাঙা গলায়, বিচিত্র স্বরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে, মাহাজন শেষে মোক এই শাস্তিটা দিলেন। মোর নয়নতারা তো কারো কুনো ক্ষতি করে নাই।

শাজাহান চৌধুরী আঁচ করেন ব্যাপারটা। বেলায়েতকেও মনে পড়ে সেই সময়। আর ভয়ানক রাগ হয় তখন তাঁর। দারুণ রেগে গিয়ে প্রায় ধমকে উঠেন—কি হইছে কহ, কি হইছে তোর?

আর ঠিক ঐ সময়ে বৃষ্টিটা শুরু হয়ে যায়। ফলে মানুষগুলো এদিক ওদিক সরে যায়, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায়। কিন্তু কাছাকাছি গাছের আড়াল নেই বলেই কি না কে জানে তারা বৃষ্টিটাকে উপেক্ষা করতে থাকে। তখন মানুষের দঙ্গলটাকে আরো জমাট, আরো স্থির এবং আরো কঠিন দেখতে লাগে।

ছোট মহাজন দেখেন এবং উপেক্ষা করার জন্যেই গাড়ি চালিয়ে যাবার আদেশ দেন। আর তাতে ভিড়টা যেন আরো ছোট হয়ে আসে। শুধু মনোহর বর্মনই নয়—তখন আরো কয়েকজন পথরোধ করে দাঁড়ায়। ছোট মহাজন বুঝে উঠতে পারেন না মানুষগুলো কি চায়। কেন এই সম্মিলিত বাধা, কেন এই কঠিন নীরবতা। একটু আগে মনোহর বর্মনের গলায় কিছু অভিযোগ ছিলো—সেই সঙ্গে আর্তহাহাকারও শুনতে পেয়েছিলেন—কিন্তু এখন আর সে রকম কিছু নেই। তাঁর কেমন মনে হয় লোকগুলো তাঁর কাছে প্রতিকার চাইতে এসেছে। লোকগুলোর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে কেন যে তিনি লোকগুলোকে অসহায় এবং নিজেকে রাজা ভাবলেন এও আরেক রহস্য। তবে

তাঁর মনে স্বস্তি এলো, নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসে দৃঢ় হলো। তিনি একটুখানি বক্তৃতার জন্যে তৈরি হলেন।

এও এক প্রাচীন নিয়ম। মূর্খ এবং দাসানুদাস কিষাণ বিভ্রান্ত, আহত এবং ক্ষুব্ধ হলে তাদের সামনে বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করতে হয়, বিশ্লেষণ দিতে হয় এবং পরিশেষে কিছু পরামর্শ এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোটা ব্যাপারটা হাতের মুঠোর মধ্যেই রাখতে হয়। এ রকম ক্ষেত্রে ভয় করলে চলে না। এবং সেই প্রাচীন নিয়ম মতোই তিনি বক্তৃতা করলেন। বললেন, ঘটনা গুরুতর—এর প্রতিকার অবশ্যই কর্তব্য। প্রতিকার না করলে এ রকম ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটতেই থাকবে। এ তেমন অপরাধ নয় যে মাফ করা যায়—এ অপরাধের শাস্তি কঠিন হওয়া উচিত। তবে কাজটা ঠাণ্ডা মাথায় করা দরকার। কেননা যারা এই জঘন্য কাজ করেছে তারা অতিশয় শক্তিশালী। তাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র আছে।

বক্তৃতা কিছুটা দীর্ঘ করলেন। থেমে থেমে বক্তৃতা করার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করলেন তাঁর কথার কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝা গেলো না। কেননা বৃষ্টি এবং অন্ধকার সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মুখভাব ঢেকে রেখেছিলো, উপরন্ত তারা নড়ছিলো না, কোনো শব্দ করছিলো না, ডাইনে-বাঁয়ে নজর ফেরাচ্ছিলো না। ছোট মহাজন বক্তৃতা শেষ করে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু লোকগুলো বোধ হয় তখন সত্যি সত্যিই পাথর।

কি হইল্ বাহে, হামাক যাবা দেন।

এবারও ছোট মহাজন স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলেন। কলিমউদ্দিন তখনো ছোট মহাজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে টের পায় তার দাড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরছে। সে এগিয়ে এলো, মহাজন আইজই মনোহরের বেটিক ফিরায় আনিবা হোবে।

আইজই? শাজাহান চৌধুরীর হাসি পেয়ে যাচ্ছিলো; কিন্তু সামলে নিতে হলো তাঁকে। মধ্যরাতের নিজন রাস্তায় কোনোরকম বিবাদ হোক তিনি চান না। বললেন, ঠিক আছে হামার বাড়িত চলেন, ঐঠে বসে উপায় বাহির করা যাবে।

না ঐঠে নহে, এইঠে ঠিক করেন, এখুনে। কার যেন গলার স্বর গনগন করে উঠলো।

আর ঠিক ঐ সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ যেন তীব্রস্বরে বলে উঠলো, জানেন না মাহাজন ? কে লিয়ে গেইছে মনোহরের বেটিক, জানেন না ?

আমি কি জানি ? ছোট মহাজন নিজেকে শুধান। ভেবে পান না কী করবেন। বলে দেবেন কি যে কাদের এই কাজ, কারা এই রকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ? বলবেন কি ? পরক্ষণে নিজেকে সামলে নেন। মাথা খারাপ, সে কথা কি বলা যায় ? শাজাহান চৌধুরী কথা বললেন না। পেছন থেকে উঠে আসা ঐ তীব্র অভিযোগটা যেন শুনতেই পাননি এরকম ভাব করলেন।

এবং ঐ পেছন থেকেই কে আরেকজন বলে উঠলো, ছাড়ে দে শালাক. চল হামরাই খোঁজ করে দেখি।

হ্যাঁ শালাক ছাড়ে দেন—উ শালাক দিয়ে কিচ্ছু হোবে নাই।

অন্ধকারের আড়াল থেকে উঠে আসা কথা। কে বলছে ধরা মুশকিল। ছোট মহাজনের গায়ে জালা ধরে যায় ঐরকম মধুর সম্বোধনে। তিনি না-শোনার ভান করেন। তিনি জানেন এসব ক্ষেত্রে মেজাজ দেখাতে নেই। এতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি গোটা ব্যাপারটাই আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। এখন মাথা গরম করলে তার খেসারত যে কি হবে তা তাঁর জানা।

বৃষ্টি সমানে ঝরছে। হাওয়া বইতে শুরু করেছে সেই সঙ্গে। বৃষ্টি এবং হাওয়া যুগপৎ প্রায় দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে বলে তাঁর আশা হলো—এবার শান্ত হবে মানুষগুলো। বললেন, এইঠে খাড়ায় খাড়ায় ভিজলে কি লাভ হবে কিছু, চলেন হামার বাড়িত চলেন—ঐঠে বসে ঠিক করা যাবে কি করা যায়।

লোকগুলো এ প্রস্তাবে মুখ ফেরায়—অন্তত: সেরকমই মনে হলো শাজাহান চৌধুরীর। আর ঐ সময়ই মনোহর বর্মন, নয়নতারারে—ও মোর জননী ঈ ঈ ঈ—ওহ্ হো হো হো বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

তার ঐ কান্নার মধ্যে কী যে মন্ত্র ছিলো কে জানে। লোকগুলো আন্দোলিত হলো। স্পষ্ট দেখা গেলো, পেছনের দিকের কিছু লোক ডাইনে-বাঁয়ে গেলো। কী হবে বুঝতে না পেরে ছোট মহাজন বিচলিত ভীত স্বরে চিৎকার করে উঠলেন—নেহাল!

সঙ্গে সঙ্গে নেহাল বন্দুক আকাশের দিকে তুলে আস্তে ট্রিগার টেনে দিলো। আর ঐ ঘটনাতেই ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেলো। বলশালী বলদ দুটি আচমকা শূন্যে লাফিয়ে উঠে দড়ি ছিঁড়ে নিমেষে কোথায় যেন চলে গেলো। লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ ভয় পেয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো গাড়িখানা উল্টে গেলো, গাড়োয়ান ছিটকে পড়লো মাটিতে এবং শাজাহান চৌধুরীর মাথায় বন্দুকের কুঁদোটা এসে লাগলো।

সে এক অভিনব দৃশ্য। তুমুল বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপাদাপি, তার মধ্যে ঐ রকম মানুষের উত্তেজিত আন্দোলিত ভিড় আর ভিড়ের মধ্যে আবার দেখো গাড়ি বলদ গাড়োয়ান এবং পার্শ্বচর কর্মচারীসহ মহাজনের উৎক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত এবং চূড়ান্ত পতনের অবস্থা।

হাস্যকর, কিন্তু হাসে না কেউ। কয়েকজন দূরে সরে গেলেও প্রায় সবাই তখনো ঘিরে রয়েছে। ছোট মহাজনের শরীরের পশ্চাদ্দেশে ও মাথায় যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও দেখতে পেলেন মানুষগুলো কাকে যেন খুঁজছে। কে যেন চিৎকার করে উঠলো, ক্যানে গুলি করিল শালা, ঐ শালা নেহালের কাম, ধর শালাক।

যেন বা হাসির কিছু। কেউ কেউ হেসেও উঠলো শব্দ করে। আর ঐ হাসির শব্দে কী যে ছিলো বোঝা গেলো না। দেখা গেলো, নেহাল লাফিয়ে উঠে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পরনের লুঙি ফেলে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তাকে ঐভাবে ছুটতে দেখে—ঐ পালাছে শালা, ধর শালাক, ধর বলে কয়েকজন লোকও তার পেছনে পেছনে ছুটলো।

গোটা ব্যাপারটা ক্রমে অবিশ্বাস্য জটিল এবং হাস্যকর হয়ে উঠলো। একটি মেয়েকে ততক্ষণে হয়তো বলাৎকারের চূড়ান্ত করা হয়েছে। কে জানে, হয়তো মেয়েটিকে তারা হত্যাও করে ফেলেছে, এদিকে মেয়ের জন্যে বাপ হাহাকার করছে—সবাই মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে—এরই মাঝখানে দেখো এই রকম জটিল এবং হাস্যকর কাণ্ড। দেখে মনোহর বর্মনের বিভ্রান্তি লাগে। বুঝে উঠতে পারে না কেন এমন হচ্ছে। কেন তারা এইরকম জড়ো হয়ে সড়কের মাঝখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কেন এই হট্টগোল, কেনইবা মহাজনের বন্দুক ছুঁড়ে গাড়ি ওলটানো আর কেনইবা একদল লোকের একজনের পিছনে অমনভাবে ছুটে যাওয়া। সে ভয়ানক হতাশ হয়ে কেঁদে উঠলো— কলিমদ্দিরা মোর

নয়নতারাক মুই আর পামু নাই—মোর নয়নতারাক মারে ফালাবে—ও মোর মা রে—

ঐ কান্নার চিৎকার বৃষ্টির মধ্যে চাপা পড়ে যাবার কথা, কিন্তু যায় না। চিৎকারটা প্রথমে বৃষ্টি ভেদ করে, তারপর অন্ধকার ভেদ করে, তারপর মানুষের ভয় সংস্কার সুখ শান্তি সাধ ভালোবাসা ভেদ করে আদিম জায়গায় গিয়ে যেন বিদ্ধ হয়। আর তাতে ছোট মহাজন ত্রাসে লাফিয়ে উঠে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেন। আর তাঁর পেছনে পেছনে ধাওয়া করে সবগুলো মানুষ ছুটতে থাকে।

পুনর্বার বেয়নেট

খুঁজতে খুঁজতে শহরের এ পাড়া থেকে যেতে হয়েছে ও পাড়ায়। দুপুরের চড়া রোদে গরম লাগে, দরদর করে ঘাম ঝরে জামার নীচে, প্যান্টের নীচে ঘাম চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। কিন্তু তবু ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। বলে দিয়েছে—আছে ওরা, এখানেই আছে কোথাও। নিশ্চিত খবর, ওদের ধরে এনে রাখা হয়েছে নতুন শহরেরই কোনো একটা জায়গায়। ক্যান্টনমেণ্টে নিয়ে যায় নি এখনো, খুঁজে বার করো।

সকাল থেকে খোঁজা শুরু হয়েছে। এদিকে রোদ চড়চড় করে উঠলো মাথার উপরে। রাস্তাগুলো হয়ে এলো শুনসান। গাছে পাখিও ডাকে না। ল্যাম্পোষ্টের তারে ছেঁড়া ঘুড়ি সুতো পেঁচিয়ে লটকে আছে। মোড়ে মোড়ে দেখো গুমটি ঘরের মতো ছোট ছোট খুপরি, ফোঁকরের ভেতর থেকে কালো নল বার করা। হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডির সাত নম্বর আট নম্বর রাস্তা চষে এলো। পাঁচ নম্বরের মাথায় একটা ক্যাম্প। মোড় থেকে সেণ্ট্রির পাহারা আরম্ভ। একটুখানি দাঁড়িয়েছিলো, অমনি কালো মতো এক বেঁটে বিহারী লোক ধমকে উঠলো—এ সালা কিয়া মাংতা, ভাগো হিঁয়াসে। লোকটার ঘাড়ে থ্রি নট থ্রি। পায়ে আঁটা গাবদা বুটের ভারে দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়। মাথায় হেলানো ব্লেজারের টুপি—চোয়াল বেয়ে ঘাম ঝরছে। সম্ভবতঃ বিরক্ত হচ্ছে লোকটা। সুতরাং সরে আসতে হলো। না, এখানে নেই। বড় রাস্তার মুখে ও রকম আস্তানা থাকবার কথা নয়। থাকলে পাহারার কড়াকড়ি হতো, গেটের সামনে দিয়ে নির্জন দুপুরে হাঁটতে দিতো না কাউকে। আর একখানা গাড়ি সেণ্ট্রির গা ছুঁয়ে প্রায় ছুটে গেল যখন, তখনও লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো, চিৎকার করে হৈ চৈ বাধালো না। এইসব দেখেই বোঝা গেলো, এখানে নেই।

সুতরাং আবার হাঁটা। এই এক কাজ শুরু হয়েছে পঁচিশের রাত থেকে। ইচ্ছে অনিচ্ছের বাইরে চলে গেছে একেবারে। শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া একটা যার সঙ্গে মগজের বলো, ইচ্ছের বলো, কোনো যোগ নেই। পা যেন নিজের তাগিদে চলে এখন।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় পড়লো আবার। লোক চলছে দুটি একটি, রিক্সা যাচ্ছে থেকে থেকে, কখনও বা গাড়ি। একটা আর্মি ভ্যান গেলো।

পেছনে হেলমেট আঁটা বন্দুক উঁচানো সৈন্য। ভারী গম্ভীর মুখ মানুষগুলোর। সম্ভবতঃ কোন অপারেশনে যাচ্ছে। খাকি পোষাকের লোকগুলোকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন পাক দিয়ে উঠলো পেটের ভেতরে। এই রকম গাড়ীতে চেপে এসেছিলো রাস্তার মোড়ে। তারপর লাফিয়ে নেমেছিল রাস্তায়। বুটের শব্দ হচ্ছিলো। বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, চুপচাপ থাকো, ভয়ের কিছু নেই। বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো। দরজার আড়ালে ছিলেন মা। মিনটু নিনট পপি পেছনের পাঁচিলের কাছে। আর সে নিজে ছিলো কোথায়? মনে পড়ে না। তবু মনে হয়, সর্বত্র ছিলো সে—দরজার কাছে, গেটের কাছে, খাটের তলায়, ঘরের মাঝখানে, উঠানে, বারান্দায়. হ্যাঁ সর্বত্র ছিলো সে।

বাবা দোয়া পড়ছিলেন। ফ্যাকাশে মুখে দরজার দিকে তাকিয়েছিলেন। বাইরে রাইফেলের ঠাস ঠাস শব্দ হচ্ছিলো। গেটের কাছে উঠোনের নিমগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বাইরে ধোঁয়াটে আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। আর থেকে থেকে স্তব্ধতা ভারী হয়ে নামছিলো। বেলা ক'টা তখন মনে নেই। শুধু মনে আছে, রোদ ছিলো দরজার কাছে।

বাবা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তারপর কি হলো বোঝা যায় নি, পরক্ষণে বাবা অস্ফুট আর্তনাদ করে কুঁজো হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। বাবার বিস্ফারিত চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিলো সে। বাবা গোঙাতে গোঙাতে কী যেন বলছিলেন, আর দরজার কাছে তিনজন. হ্যাঁ তিনজন একে একে বেয়নেটে গাঁথলো বাবাকে। বাবার শরীর তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছিলো। কোন শব্দ হয়নি। ভাই বোনেরা দেয়াল টপকাতে ব্যস্ত ছিলো। মা বোধ হয় ছুটে এসেছিলেন। তারপরও সে দেখতে পাচ্ছিলো একজন বাবার চোখের ভেতরে বেয়নেট ঢোকাচ্ছে. বেয়নেটের চকচকে ফলাটা কী মসৃণ ঢুকে গেলো। তারপর আবার বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে। একজন বোধ হয় লাথি মারছিলো, কেয়া সালে, জয় বাংলা বোলো।

বাবা মরতে দেরী করেন নি। তারপর যখন ওরা ঢুকলো ভেতরে, মা'কে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, একজন মা'র পেছন দিক থেকে পিঠে বেয়নেট গাঁথলো—মা, দুর্বল মা, পড়ে গেলো না। আশ্চর্য! কারো চিৎকার নেই. নিঃশব্দতা সীসার মতো ভারী। প্রখর রোদে নিমগাছের এ শুকনো ডালের ছায়া কেমন আঁকা বাঁকা হয়ে পড়েছে গেটের

কাছে, আর ঠিক তখনই সে লাফিয়ে পড়েছিলো পাশের বাড়ীর উঠোনে। তারপর আরেকটা পাঁচিল, তারপর আরেকটা, তারে পরে আরেকটা। পাঁচিলের আর হিসেব নেই।

লাফাতে হবে, যথেষ্ট লাফাতে হবে, কুইক মবিলিটি চাই, বোঝাচ্ছিলেন সুবাদার সোলেমান সাহেব। শুধু বোঝানোই নয়, সত্যি সত্যি লাফিয়ে দেখাতে হয়েছিলো। আর সবাই লাফিয়ে দেখিয়েও দিচ্ছিলো, কেমন ক্ষমতা কার। পার হয়ে যাওয়া সব অল হার্ড্‌লস, কোথাও থামা নেই। পা দুটোকে ভারী নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে সেই থেকে। আসলে পা ঠিক চালিয়ে নেয়, আপনা থেকে চালিয়ে নেয়। কাউকে বলে দিতে হয় না।

হাঁটতে হাঁটতে নিউ মার্কেট। চায়ের দোকানে বসা। বসে বসে অপেক্ষা করা। ফটোর দোকানে তুমুল ভীড়। সবার ঘাড়ে রাইফেল, আর অফিসারদের সাজের বহরটা দেখো। কোমরের দুদিকে দুটো রিভলভার তাতেও ভরসা নেই—হাতে আবার ষ্টেন। শখের বাজার করতে বেরিয়েছেন বাবুরা ভেতরে ঢুকিয়েছেন জীপ, বেগতিক দেখলে যেন ছুটে পালানো যায়!

দরজার আড়ালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখে সে। একজনের চেহারা মেলাতে চেষ্টা করে। ঐ তিনজন এক সঙ্গে—ভারী মুখ, মোটা ভুরু, উঁচু নাক, চুলগুলো ছোটো ছোটো—কটা, তামাটে রং। তিনজনকেই লক্ষ্য করে দেখে। যে লোকটা ফটোর দোকানে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলো—একবার মনে হয়, এ বোধহয় সে-ই। একবার রাস্তায় দাঁড়ানো লোকটাকে মনে হয়, আরেকবার মনে হয়; যে-লোকটা সদা দোকানের বারান্দায় উঠলো এ বোধ হয় সেই লোক—সেই তিনজনের একজন। ভারী মজার কিন্তু, কেমন হাসি পায় এখন। চেনবার জো নেই হারামজাদাদের—সব এক চেহারা। দেখতে দেখতে কেমন গুলিয়ে যায়। শেষে মনেই থাকে না সেই তিনজনের চেহারা ঠিক কি রকম ছিলো।

চা খাবার জন্যে যেটুকু সময়ের দরকার তারই মধ্যে এসে গেলো বেলায়েত। এসে বসলো মুখোমুখি। ঘেমেছে খুব। ঠাণ্ডা পানি চাইলো। পানি খেয়ে মাথাটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলো কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ বসলো ঐ ভাবে। যেন সাসপেন্স দিচ্ছে। বেলায়েতের রকমই ঐ। কথা ছাড়তে চায় না সহজে। শেষে জানালো, হয়েছে, খবর পাওয়া গেছে।

কোথায় ?

জবাব দিলো না বেলায়েত। বললো, যাবি তুই ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

এখুনি ?

বাঃ এখন নয়তো কখন।

ওদিকে খবর টবর দেবো না, গাড়ি যোগাড় করতে হবে না। আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না, যা দূর।

বেলায়েত বিরক্ত হয় বোধহয়। বোধহয় হাঁটতে ইচ্ছে করে না ওর, কে জানে। তার নিজের ভারী অবাক লাগে, হাঁটতে ইচ্ছে করবে না কেন। ইচ্ছের সঙ্গে হাঁটবার কি সম্পর্ক! এক সময় হাসি পায় বেলায়েতের অবস্থা দেখে। নিশ্চয়ই ওস্তাদ ভালো ছিলো না ওর। পড়তো সোলেমান সুবেদারের পাল্লায়, মজা টের পাইয়ে দিতো বাছাধনের।

তারপর দুজনে উঠলো। বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলো। গেটের কাছে আবার একঝাঁক খাকি। হয়েছে কি আজ এদের ? বেলায়েত বললো। সে শুনলো না। শুনে কোন লাভ নেই, শুধু দেখে যাও। দেখলো সে, এক এক করে প্রত্যেকের মুখ দেখলো। কোন লোকটা ? কোন লোকটাকে দেখেছিলো সে ? এবারও সেই ডোমকানা অবস্থা। চিনতে গেলেই তালগোল পাকিয়ে যায়।

বেলায়েত তাকে দাঁড়াতে বলে চলে গেলো এক কাপড়ের দোকানের ভেতর। মালিককে কি বললো হাসতে হাসতে। তারপর ফোন করলো কাকে। ফোন করবার সময় কেমন চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কায়দা করতে লাগলো চৌকষ লোকের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো বেলায়েতকে। ওদিকে শাড়ির খদ্দের এক ভদ্রলোক আবার বউকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে। মাথার ওপরে ঝোলানো শাড়ি— নানান রঙ ঝলমল করছে। ফ্যানের ব্লেডের গায়ে শাড়ি জড়ানো—এও এক ফিকির, দেখো নানান রঙ মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে কেমন। দূরে দেখো তিনটে পাঞ্জাবী মেয়েলোক আসছে, মস্ত মস্ত পেট উঁচিয়ে। পেটের ভেতরে বাচ্চা আছে নাকি! বাপ, কি পেট অ্যাঁ! একসঙ্গে ঠিক তিনটে বাচ্চা বেরুবে। ঐ পেটে না জানি কি সাইজের বাচ্চা ধরে। হাসছে কেমন দেখো। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে চললো চারদিকে—এইসব কাণ্ডকারখানা। দেখলো

আর খুঁজলো। একেক সময় শুধু শুধু খোঁজে। এই এক মজা হয়েছে—কোন কিছুর সঙ্গেই তোমার নিজের কোনো যোগ নেই। খুঁজে মরছো, ইদিকে ভুলে বসে আছো কোন বস্তুটা দরকার। কি খুঁজছি আমি ? এক সময় নিজেকে জিজ্ঞেস করে তবে আত্মস্থ হয়। তখন আবার খোঁজা বন্ধ করে। তখন আবার শাড়ি দেখে, খদ্দের দেখে—মেয়েমানুষ দেখে, খাকি পোষাক দেখে—বুটের শব্দ শোনে। খাকি সৈন্যদের হাতের অস্ত্রগুলোকে চিনতে চেষ্টা করে। কোন দেশী অস্ত্র মনে মনে তাই অনেকক্ষণ ধরে আন্দাজ করে।

বেলায়েত ইচ্ছে করেই দেরী করে বোধহয়। দোকানঅলার কাছ থেকে সিগ্রেট নিয়ে ধরিয়েছে কেমন দেখো—যেন মস্ত মালদার খদ্দের। আবার শাড়ির দরও করে। সে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ বেরিয়ে আসে।

আবার হাঁটা। হাঁটার যেন আর শেষ নেই।

হাঁটা আর খোঁজা। বেলায়েত বলে যায়, ঠিকানা পাওয়া গেছে—কিন্তু নিজের চোখে না দেখে এ্যাকশন নিতে বলি কেমন করে! হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখতে চায় সবাই। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে চায় না কেউ। বিশ্বাস তাহলে কি বস্তু বোঝো। রাখ হরি বিশ্বাস, বিশ্বাস করতে চায়নি। নিজের চোখে দেখেছিস তুই ? খালি জিজ্ঞেস করতো। নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলো বলে লোকটা তিনটে টুকরো হলো। হ্যাঁ, গুণে গুণে তিনটে টুকরো। লাল রক্ত-মাখা মাংসের টুকরোগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছিলো। মাংসের টুকরো, কিন্তু তাতে আবার মানুষের গায়ের চামড়া লাগানো। একেবারে নতুন জিনিস, নতুন এবং অচেনা। রাখ হরি বিশ্বাস, হরি বিশ্বাস রাখো, নাকি বিশ্বাস রাখো হরি ? ও তিন রকমই হতে পারে। হরি, বিশ্বাস এবং রাখো—তিন রকমেই সাজানো যায়। বেলায়েত কথা বলে না, খালি থেকে থেকে পেছনে তাকায়!

রোদ যেন আরো প্রখর হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাটা। কুকুর দেখতে ইচ্ছে করলো হঠাৎ। রাস্তার ধারে, আশ্রয় সন্ধানী, গাছতলায় জিভ বার-করা হাঁপানো কুকুর। ডাইনে বাঁয়ে খুঁজলো।

মজা দেখেছিস, একটা কুকুর নেই কোথাও

বেলায়েত পেছনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো, ঐ আসছে বোধ হয়।

দেখা গেল দূরে একখানা ফোক্সওয়াগন আসছে।

কিন্তু না, থামলো না।

ধুশ শালা বলে গাল দিয়ে উঠলো বেলায়েত।

আবার হাঁটা এবং থামা, আবার হাঁটা এবং থামা। আবার হাঁটা আবার থামা। কতোবার—হিসেব রাখা যায় না। থামা বলো কিম্বা হাঁটা—একই প্রক্রিয়া।

তুই বরং এক কাজ কর, এদিক ওদিক মিছিমিছি ঘুরে কোনো লাভ নেই। ঐ গ্রীনরোডের ঠিকানাতেই চলে যা। আমরা আসছি, যা করবার ঐখানেই করবো। চব্বিশের দুই মনে রাখিস, পাশের বাড়িটা পঁচিশ, ঐখানেই রেখেছে এখন। চব্বিশের দুই, আবার মনে করিয়ে দিলো বেলায়েত। বললো, একটা মস্ত আমগাছ আছে পাঁচিলের কাছে, একটা নারকেল গাছ আর সেই সংগে লাল রঙের বারান্দায় রেলিঙ আছে লোহার। পঁচিশে সেন্ট্রি থাকে সব সময়. পঁচিশ পর্যন্ত এগুবি না, ফার্মগেট হয়ে যাবি। বলবি বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওখানেই থাকবি আমরা না আসা পর্যন্ত। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি, ছ'টা নাগাদ পৌঁছে যাবো।

এবং আবার হাঁটা। গ্রীন রোডে যাবার রিক্স নেই। ফার্মগেট ? না, সেদিকেও যেতে চায় না। একজনকে ডাকলো, কিন্তু সে মাথা নেড়ে অন্য দিকে সরে গেলো। আরেকজন, সেও যেতে চায় না। রোদ্দের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বসংসার রোদে ঝলসাচ্ছে তখন। রিক্সঅলা বুড়ো মানুষ, কালো চামড়া ঝুলে আছে শরীরে। গালে শাদা দাড়ি, ঘোলাটে চোখ পিটপিট করছে, না—যাবে না—আর দূরের পথে যেতে পারবে না সে।

দুখানা আর্মি জীপ তীর বেগে চলে গেলো। দেখলো সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। না সোজা গেলো না, বাঁয়েও না। ডাইনে বাঁক নিলো। তার মানে গ্রীন রোড, ঐ একই রাস্তা, যে রাস্তায় তাকে যেতে হবে। তাহলে গন্তব্য পথ ঐ একটাই, বোঝো, মানুষের কি দশা। ঘুরে ফিরে ঐ একটাই রাস্তা—গ্রীন রোড। সবুজ পথ—সবুজ পথের শেষে কোথায় আছে লাল রঙের নিশানা, তাই খুঁজে বার করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছানো ঐ লাল জায়গায়। লালটা কিসের ? কে জানে বাপু, রক্তের হয়তো। হ্যাঁ, রক্তের হতে পারে। তার নিজের রক্ত কিম্বা তার বাবা মা'র, কিম্বা ওদের কারো। রক্ত কিন্তু ভারী মজার। যখন

ছোটে তখন থামানো যায় না। ফিনকি দিয়ে বেরোয়, পিচকারির মতো ঠিক। মনে হয় ভেতর থেকে কেউ ঠেলে বার করে দিচ্ছে। চন্দনের ঘাড় থেকে বেরুচ্ছিলো; গলগল করে বেরুচ্ছিলো। চন্দন গালাগালি করছিলো নিজের রক্তস্রোতকে—ধুশ্ শালা বন্ধ হ না। ডেকে বলছিলো কামালকে, দ্যাখ বন্ধ করতে পারিস কি না। না পারলে ঘাড়ে তোল আমাকে. নিয়ে চল ক্যাম্পে।

ওকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছিলো দীর্ঘ পথ, আর রক্ত সমানে বেরিয়ে আসছিলো। ঘাড়টা ভিজে গিয়েছিলো রক্তে। সবুজ ধান গাছের ওপর, ফোঁটায় ফোঁটায়, হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে, শরীর বেয়ে, কেবলই ঝরে পড়ে যাচ্ছিলো। ঐ একই প্রক্রিয়া—সবুজের উপর লাল।

বাড়িটার নম্বর খোঁজার দরকার ছিলো না, দূর থেকেই চেনা গেলো! প্রকাণ্ড বাড়ি, ভেতরটা অনেক দূর পর্যন্ত পাঁচিল ঘেরা, নানান ধরনের ছোট বড় গাছ। গেটের কাছে দুজন সেন্ট্রি, ভেতরে আরো আছে হয়তো, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। তবে বাড়িটা দেখেই বোঝা গেলো, এটাই সেই আসল জায়গা—এখানেই আছে ওরা। এখানেই এনে রাখা হয়েছে আপাততঃ। এখন লোভ টোভ দেখানো হবে—তারপর অত্যাচার শুরু হবে—এবং তারপর শেষ কাজ। শেষকৃত্য সেজন্যই বোধহয় বলা হয়ে থাকে। বাড়ির ভেতরে মেলা জায়গা, গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলার অসুবিধা কিছু নেই।

সেন্ট্রি দুজন দেখলো না। হেসে হেসে খোশগল্পে মশগুল।

বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশ্বাস থাকেন এখানে? কোন বিশ্বাস? ও হো, সেটা তো জানা হয় নি। কোন বিশ্বাস? কি মুশকিল। ভারী বিপদের কথা কিন্তু। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি ভাবছো, কোন বিশ্বাস। লোকটার মনে সন্দেহ গাঢ়তর হচ্ছে, সে দেখলো। শেষে বললো, ঠিক আছে, বিশ্বাস মশাইকে ডেকে দিন—এলেই আমাকে চিনবেন। বেলায়েতকে চেনেন?

বেলায়েতকে চিনবো না। লোকটা এবার নিঃসন্দেহ হলো কিছুটা। বললো, বেলায়েতকে আমার বাবা শুদ্ধ চেনে।

শুধু বাবা কেন, চৌদ্দগুষ্টি শুদ্ধ চেনা উচিত, বললো সে। এবং তার পর সে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ভদ্রলোকের বাবা নেই। নেই চৌদ্দগুষ্টির কেউ। অথচ কাদের কথা যে বললেন ভদ্রলোক! সে ভেবে পায় না।

কোন বিশ্বাস তার ঠিক নেই, ভদ্রলোকের বাপও নেই, চৌদ্দ গুষ্টিরও কেউ নেই, এখন কে চিনবে বেলায়েতকে—এবং সেই সুবাদে তাকে ?

ভদ্রলোক বললেন, চিলে কোঠায় যেতে হবে। ওখান থেকে দেখা যায় বাড়ির ভেতরকার উঠোনটা,—ঐ খানে গত কদিন ধরে টর্চার করা হচ্ছে। আজকে এনেছে দুজনকে—সকালে নিয়ে এসেছে। দুপুর থেকে আরম্ভ হয়েছে টর্চার। কথা শুনতে পাবেন না—শুধু দেখবেন।

ভদ্রলোক ঐ চিলে কোঠার মধ্যেই থাকেন বলে মনে হলো। সিঁড়ির পাশে একটুখানি জায়গা, ওখানেই পাটি বিছানো, বালিশ একটা আর ঐ খানেই একটা ফিল্ডগ্লাস। ভদ্রলোক ফিল্ডগ্লাসটা হাতে তুলে দিলেন। বললেন, দেখুন কাউকে চিনতে পারেন কি না।

জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা. মাঝখানে আবার কাচ। লেন্স এ্যাডজাষ্ট করাই ছিলো। দেখা গেলো, শেষ বিকেলের আলো, তবু দেখা গেলো। হাত-বাঁধা মানুষ, আরেকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। চোখ মুখ ফোলা, চেনা যায় না। হাত-বাঁধা লোকটাকে চেনা গেলো—মনসুর। মুখের ভাবে কিছু বোঝা যায় না। কী ভাবছে এখন মনসুর ? হঠাৎ প্রশ্নটা মনে এলো। তারপর দেখলো—একজন কী কী বলছে মনসুরকে। পড়ে থাকা লোকটাকে আরেকজন লাথি মারলো। অন্য আরেকজন ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এলো, হাতে তার ছুরি। মনে হলো, খোঁচা দেবে কোথাও। ভারী অবাক কাণ্ড তো, টর্চারের জন্য অমন ছুরি লাগে নাকি ? ওতো গরু জবাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়। দেখতে. লাগলো সে আরো মনোযোগী হয়ে। চিৎ করা হলো মানুষটাকে, তারপর মানুষটা যখন ভয় পেয়েছে, হাত তুলেছে বোধহয় অনুনয় করে, দুর্বল ভাঙ্গা পা ঘষলো মাটিতে—আর তখনই বুকের ওপর চেপে বসলো ঐ ছুরিঅলা। আর কী রকম অবলীলাক্রমে ছুরিটা চালিয়ে জবাই করে দিলো। পষ্ট দেখা যাচেছ গলগল করে রক্ত বেরুচেছ। ছুরিঅলা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। মনসুরকে কী বলছে হেসে হেসে, আর মনসুর তখন চিৎকার করে কী যেন বলে উঠলো। বোধহয় থু থু ছিটালো ঘেন্নায়। আর তারপর—দেখো মানুষটাকে লাথি মারলো একজন পেছন থেকে, আরেকজন বলা নেই কওয়া নেই সামনে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলে গুলি করলো মনসুরের বুকের ওপর। গুলির শব্দটা দিব্যি শোনা গেলো। মনসুর গড়িয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

বিশ্বাস শুধু জিজ্ঞেস করলেন, মারলো একজনকে, তাই না?

সে কিছু বললো না, শুধু বিশ্বাসের হাতে ফিরিয়ে দিলো ফিল্ডগ্লাসটা। বিশ্বাস দেখলেন আর ঈশ্ ঈশ্ করলেন আক্ষেপে। মনে হলো বিশ্বাস আর্তগলায় চিৎকার করে উঠবেন। একবার খালি শুধালেন, চেনেন আপনি?

হ্যাঁ একজন মনসুর—আমাদের লোক, আরেকজন বোধহয় ওর সঙ্গী, ওকে আগে দেখিনি।

বিশ্বাস আর কিছু বললেন না, নীচে নেমে গেলেন। সে দেখতে লাগলো গাছপালাগুলো কী ঘন ঐ বাড়িটাতে। বাড়ির মালিক সম্ভবতঃ শৌখিন মানুষ ছিলেন। গাছগুলো চিনতে চেষ্টা করলো। মানুষ যে কেমন করে এতো পাগল হতে পারে ভেবে পায় না সে। মিছিমিছি কত রকমের দেশী বিদেশী গাছ লাগিয়ে রেখেছে বাড়িময়। ওতে যে কি আনন্দ কে বলবে। দেখলো বাড়িটার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল—ভেতরে ঢোকা বেশ কষ্টের। দরজা ঐ একটাই। ইদিকে বরং বিশ্বাসদের বাড়িটা ভালো। কে জানে, ভদ্রলোকের নাম সত্যি সত্যি বিশ্বাস কিনা। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো। বিশ্বাসদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরুবার পথ আছে। বাগান টাগানও আছে—কিন্তু ওরকম নয়। শখের বাড়ি নয় এটা—এটা বাস করার জন্যে, প্রয়োজনের জন্যে তৈরি করা বাড়ি।

ফিল্ডগ্লাসটা রেখে চলে গেছেন বিশ্বাস। সে ছাতে গেলো না। বিছানো পাটিতে টান হয়ে শুয়ে পড়লো। শুয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, চোখ বুঁজলো না। চোখ বুঁজলেই ঘুম চেপে ধরতে পারে। আর ইদিকে যে কোনো সময় এসে যেতে পারে বেলায়েত। সুতরাং ঘুমনো চলবে না। মুখটা তেতো লাগছে—এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পেলে হতো। উঠলো ও—সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে আন্দাজ করে নেমে এলো দোতালার চিলে কোঠা থেকে। বিশ্বাস সোফায় পা গুটিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। চোখে মুখে কী রকম একটা আতঙ্ক আর বিভ্রান্তি। পানি খাব একটু, সে পানি চাইলো।

বিশ্বাসের হাত কাঁপছে দেখলো। বললেন, লোকগুলো অমন! অথচ জানেন, ওরা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্রলোকের মতো কথা বলে।

হবে হয়তো, ভদ্রলোকের মতো কথা বলা আর কি এমন কঠিন কাজ। ওতো সবাই বলতে পারে—সে ভাবলো। বিশ্বাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু খানি হাসলো শুধু। বিশ্বাস কিন্তু থামলেন না। বললেন, এখানে

আর থাকা সম্ভব নয়, আমি আজই চলে যাবো। কদিন ধরেই টর্চার হচ্ছে—দেখছি আমি, কিন্তু এ রকম নয়। জানেন, একদিন একজনের একটা আঙুল কেটে ফেললো! আঙুল কাটা কিন্তু বেশ কঠিন কাজ। ছুরি দিয়ে ঘষে ঘষে, সে অনেকক্ষণ, দশ পনেরো মিনিট হবে, তারপর কাটলো। লোকটার সে কী গোঙানী। মুখ বাঁধা ছিলো না—কিন্তু তবু চিৎকার বেরোয়নি—শুধু গোঙাচ্ছিলো। আর আজ, ওঃ হরিবল্—মানুষ এ রকম হতে পারে!

ঘরের ভেতর থেকেই এক সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেলো। শব্দটা থামলো গেটের কাছে। গলা বাড়িয়ে দেখে বিশ্বাস বাইরে চলে গেলেন। আর গাড়িটা, একটু পর গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামলো বেলায়েত, আরো দুটি ছেলে। ছেলে দুটিকে আগে দেখেনি সে। বেলায়েত রুদ্ধশ্বাসে শুধালো, খবর কি? পেয়েছিস?

অল্প মাথা নাড়লো সে, বাট বোথ অফ দেম ডেড—এক জনকে জবাই করেছে, আরেকজনকে গুলি।

বেলায়েত পেছন ফিরে তাকালো সঙ্গী ছেলে দুটির দিকে। ওরাও মাথা নাড়ালো অস্পষ্ট। কী বললো কে জানে। কতো কী যে খেয়াল হয় মানুষের। বেলায়েত জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি বলো, রেইড করবো?

আমি কি জানি। আমার তো সে দায়িত্ব নয়—সে হাসলো।

বিশ্বাস জানালেন, ওসব করতে যাবেন না। মিছিমিছি ফেইল করলে কেলেঙ্কারী হবে—আমরা কেউই বাঁচবো না। ভেতরে ওদের অনেক লোক। ভালো প্রিপারেশন না হলে—

সে ভাবনা আমাদের, আরও দুখানা গাড়ি থাকবে দুদিকে থেকে কাভার দেয়ার জন্যে—বেলায়েত ওকে আশ্বস্ত করতে চাইলো।

আরও কী কী সব কথাবার্তা হলো সে জানে না। দেখলো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে—হালকা সবুজ রঙের ডিসটেম্পার। একটা পেন্টিং ঝোলানো। কার্পেটে ধুলো জমেছে। টিপয়ের ওপরে চায়ের কাপের গোল দাগ রয়েছে কবেকার। সামনের দেয়ালে একটা সুন্দর মেয়ের ছবিঅলা ক্যালেণ্ডার। আর ঐ ছবি দেখার সময়ই হঠাৎ শোনা গেল বাইরে কে যেন ডাকছে! গলা শুনেই বিশ্বাস জানালো, ওদের সুবেদার—সম্ভবতঃ গাড়ি দেখে খোঁজ নিতে এসেছে। বেলায়েতের চোখ নেচে উঠলো। ছেলে দুটি দেয়ালের আড়ালে

চলে গেলো থাকলো বেলায়েত আর সে। বললো, যদি একজন দুজন আসে তো আমরা সুযোগ পেলেই পিকাপ করবো।

বিশ্বাসের বিগলিত গলা শোনা যাচ্ছে—নেহি নেহি সাহাব, মেরা ভাতিজা আউর এক ছোটা ভাই আয়া, ডাউটকা কোই বাত নেহী। কিন্তু সুবেদারের গলার জেদ। ভেতরে এসে ঢুকতে চায়।

সুবেদার আর তার সঙ্গী ছোকরা সেপাইটি—কোন দেশী কে জানে—মাঝারি ধরনের মানুষ, কথা বলতে বলতে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। ওদের দেখে মনে হলো, এই দুজনই ছিলো—সেই দুজন এরাই, যে জবাই করেছে এবং যে গুলি করেছে। নাকি বাবা মা'কে যারা—দুত্তোর কী মেমোরি হয়েছে দেখো। কিছু চিনে রাখা যায় না। এবং লোক দুটো বসবার ঘরে ঢুকে খাবার ঘরের ঝোলানো পর্দা সরিয়ে দেখবার সময় ঘটে গেলো ব্যাপারটা।

গাড়ি থেকে যখন নামানো হলো—তখনও লম্বা লম্বা বস্তাপোরা দুটো বোঝা মাত্র। মানুষ ছোট হলে কি হবে—ভারী কিন্তু ভীষণ। বিশ্বাস বললেন, শালাদের ওজন দেখেছেন। দুজনেরই মুখে কাপড় গোঁজা—বোধহয় গোঁ গোঁ করছে, কিন্তু বোঝা যায় না কিছু। খোলা জায়গায় খালের ধারে বাতাসের শব্দও কম হচ্ছে না। নৌকোয় তোলা হলো, ছেলে দুটিও উঠলো, আর শেষে বেলায়েত। বিশ্বাস বললেন, আমি আর আপনাদের সঙ্গে নয়, এবার আমি ভিন্ন পথ ধরি।

ভিন্ন পথ কোথায় থাকে বিশ্বাস মশাই? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু করা গেলো না। বাতাসের শব্দ হচ্ছিলো বিষম। নৌকো এসে যখন নদীতে পড়লো তখন ভোর। দূরে একটা পেট্রল বোট চলে যাচ্ছে দেখলো। বেলায়েত শুধু জানিয়ে রাখলো পেট্রল বোট ধাওয়া করলে বেয়নট দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে শয়তান দুটোকে ফেলে দেবো পানিতে। তারপর সাঁতরে চলে যাব নিজেরা।

সকালে রোদ উঠলো আরেক খালের ভেতরে। এবং নিজেদের এলাকায় পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ মাথার ওপরে।

রোদ যেখানেই উঠুক কিছু যায় আসে না তাতে। খিদেটা প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তখন। এক ঘাটে নৌকো থেকে নামলো একটি ছেলে, তারপর খালের পাড় ধরে গাঁয়ের দিকে চলে গেলো। বললো, সামনের বাঁকে নৌকোয় উঠবে।

এখন আর সমস্যা নয়। হাঁটতে হচ্ছে না, খাওয়ার অনিশ্চয়তা নেই, রোদের তীব্রতা গায়ে লাগে না—নদীর বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা।

বেলায়েত ষ্টেনটা এগিয়ে দিলো, ধর এটা, আমি একটু আলাপ করি শয়তান দুটোর সঙ্গে। বস্তার মুখটা আলগা করা হলে সুবেদারের গোঁফশুদ্ধু মুখটা বার হয়ে পড়লো। মুখের বাঁধনটা খোলা হলো তখন। লোকটা মুখ মেলে নিঃশ্বাস নিলো কিছুক্ষণ, তাকিয়ে দেখলো বেলায়েতকে, ষ্টেন হাতে তাকে, বৈঠা বাওয়া ছেলেটাকে। তারপর ভাঙা গলায় কথা বললো, কেয়া হামলোগোকো মার ডালো গে ?

বেলায়েতকে হাসতে দেখা গেলো তখন। সে নিজে কিন্তু তখন এই হাসির কারণ খুঁজে পেলো না। হাসবার কি আছে এতে, মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চাইবে না ? বিরক্ত হয়ে বললো, বেলায়েত ওসব বাজে ইয়াকি বাদ দে তো এখন, খিদে পেয়েছে।

সেপাইটার মুখের বাঁধন খুলে দিলে সে কেঁদে উঠলো। একেবারেই বাচ্চা ছেলে! বললো, হামকো ছোড় দো বড়া সাহাব, হাম কোই কসুর নেহী কিয়া।

ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেলো ছুরি চালিয়ে জবাই করেছে শাহ আলম খান, আর গুলি করেছে সুবেদার সাব। সে কিছু জানে না—কোনো মানুষের ওপর একটি গুলি পর্যন্ত চালায়নি, মাত্র চার মাস আগে এসেছে ঢাকায়।

সঙ্গী ছেলেটা তখন ফিরে এসেছে। নৌকো ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। মুড়ি খাওয়া হলো পানিতে ভিজিয়ে। তারপর পানি, নদীরই পানি, কিন্তু ভালো লাগলো। তারপর চরে এসে উঠলো সবাই।

লোক দুটোর অন্য সব বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে তখন। শুধু হাতের বাঁধনটা আছে। বিশ্বাসের বউএর শাড়ির পাড় দিয়ে বাঁধা হয়েছিলো। কতো কাণ্ড যে করতে হয় মানুষকে। এতোক্ষণ পর এবার তার হাসি পেলো। গোটা ব্যাপারটা কী ছেলেমানুষীর মতো দেখো। ঐ টুকু সময়ের মধ্যে ছেলে দুটি দুজনের পাঁজরে ষ্টেনের নল লাগিয়ে হ্যাণ্ডসাপ করালো—বেলায়েত আর সে মাথায় বাড়ি মেরে আর্মস কেড়ে নিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে দিলো—বিশ্বাস ফরফর করে শাড়ির পাড় ছিঁড়ে বেঁধে ফেললো হাত পা। বস্তার মধ্যে ঠেসে ঠুসে ঢোকাবার সময় লোক দুটোর ঘোর কেটেছিল বোধ হয়। তখন চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল—তারপর

গাড়িতে তুলতে যা কষ্ট। কিন্তু সেও হয়েছিলো দেখতে না দেখতে। শেষে গাড়িটার তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া। ছেলেমানুষী নয়? এখন সেই রাজাধিরাজের অবস্থা দেখো।

লোকটা বালির ওপর বসে পড়লো, যাবে না আর।

বেলায়েত লাথি মারলো। উবু হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো তখন সুবাদার। আর তখন, দেখো কোন ফাঁকে ছেলে দুটি বেয়নেট লাগিয়ে নিয়েছে ষ্টেনএ। একজন বলছে, এভাবে হবে না ভাই, আমাকে দিন, বলেই সে বেয়নেটের খোঁচা লাগালো ছেলেটার পাছায়। ছেলেটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

চারদিকে নির্জন। একটা মানুষ চোখে পড়ে না। চরের একেবারে মাঝখানে—ধু ধু করছে বালুচর। মাথার ওপরে সূর্য, সে তাকিয়ে দেখলো দূরে গ্রামের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। ওদিকে বেলায়েত জিজ্ঞেস করছে, বল কোথায় কোথায় মুক্তি বাহিনীর লোকেদের টর্চার করা হয়?

তার ভারী বিরক্ত লাগলো। মিছিমিছি হ্যাঙ্গামা শুধু। সেপাইটা কী জানে, আর সুবেদারই কি জানে সব? নদীর পানিতে রোদ চক চক করছে। আর কী ছলাৎ ছলাৎ শব্দ! এতোদূর থেকেও শোনা যায়। একটা গাঙচিল উড়ছে কিছু দূরে।

ছেলে দুটি ভারী নাছোড়বান্দা। তখনও জিজ্ঞেস করছে, পঁচিশে মাচে কোথায় ডিউটি ছিল তোর, বাতা কাঁহা ডিউটি থা।

লোকটা বোধহয় স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, পারলো না। কিম্বা ভয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলাও সম্ভব। শুধু বললো, পানি।

ধুশ্ শালা, কথা বলবে না আবার পানি চায়। একজন বেয়নেটের আরেকটা খোঁচা দিলো, আর তখনই কী করে যেন একজনের বাঁধন খুলে যাওয়াতে সে লাফিয়ে উঠলো প্রায়—আর সেই চকিত মুহূর্তেই গুলি হলো। কে গুলি করলো বোঝা গেলো না। সে দেখলো, সুবেদার বোকার মত উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়োতে চাইছে। এই অবস্থায় একজনের ষ্টেন কেড়ে নিলো সে, তারপর সুবাদারের দিকে ছুটে গেলো।

ভীষণ রোদ তখন, বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে। সজনে গাছের ছায়া নেই মাটিতে। চারদিকে সার সার নিঃশব্দ বাড়ির দেয়াল নেই, কিন্তু সে

দেখলো লোকটাকে। লোকটা মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে—পা জড়িয়ে ধরতে চাইছে বোধহয়। বোধহয় কাকুতি মিনতি করছে—আমার ছেলে মেয়ে আছে, আমি তো কাউকে মারিনি, আমাকে বাঁচতে দাও—সম্ভবতঃ এই রকম আরো কতগুলো কথা সে নিজের ভাষায় বলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না সে। তখন দেখছে চারদিকে কি ভীষণ ছায়াহীন রোদ আর নির্জনতা। লোকটার পিঠ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। খাকি জামা ভিজে শুকনো বালি পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে—গলার ভেতর থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে—কতো বিচিত্র রকমের যে শব্দ বের হয় মানুষের গলা থেকে—আর তখন মনে হলো, লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছে সে। চেনা চেনা মনে হলো। মনে হলো বাবার মতো বোধ হয়—কিম্বা মায়ের মতোও হতে পারে—কিম্বা চন্দনের মতো; ঠিক বোঝা যায় না কার মতো। স্থির দৃষ্টিতে তখন দেখে। লোকটা তখনো চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে, ওর মুখ দেখে একটু হাসি পেলো ঐ সময়। কী অবাক কাণ্ড দেখো, লোকটার কী রকম জ্ঞানবদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে একেবারে। একবার ইচ্ছে হলো ঝাঁকি দিয়ে লোকটার সম্বিত ফেরায়। তারপর ঐ অবস্থায় আস্তে করে সে বেয়নেটের ডগাটা রাখলো লোকটার একটি চোখের ওপর—লোকটা মাথা সরিয়ে নিতে চাইলো, পারলো না। আর তখন একটুখানি চাপ দিলো সে হাতের টেনে। বেয়নেটটা ঢুকলো আস্তে আস্তে। ভারী মসৃণ—লোকটা হয়তো হাত পা আছড়াচ্ছে—চিৎকারও করছে সম্ভবতঃ, কে জানে—সে বলে চললো, এই রকম করে, হ্যাঁ এই রকম আস্তে আস্তে। আস্তে ঢোকাচ্ছি দেখো, আবার আস্তে আস্তে বার করছি—কী সহজ, দেখো একটুও জোর দিতে হয় না, একটুও কষ্ট হয় না। এই রবম, বেলায়েত, দেখ ঠিক এই রকম।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখলো চোখ দুটোর গর্ত থেকে কেমন সুন্দর ফোয়ারার মতো রক্ত উপচে পড়ছে। লোকটার শরীর তখন দমকে দমকে কেঁপে যাচ্ছে, পা দুখানা টান টান শক্ত হয়ে বেঁকে যাচ্ছে বিচিত্র ভঙ্গীতে। ঐ দেখতে দেখতে সে বেয়নেট খুলে একটা ধার দিয়ে গলার ওপর ঘষে ঘষে কাটতে আরম্ভ করলো। এবং এবার ডেকে ডেকে বললো, দেখ বেলায়েত, এই রকম, ঠিক এই রকম— ঠিক এই রকম করে বেয়নেট দিয়ে জবাই করতে হয়।

কোথায় আমার ভালোবাসা

এখানে বোধ হয়—হ্যাঁ এইখানে। ঠিক এইখানে। গাছের ছায়া ছিলো, চৈত্রের রোদ জ্বলছিলো ছায়ার বাইরে। না, কৃষ্ণচূড়া ফোটেনি তখনও। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিলো, কৃষ্ণচূড়ার সময় আসছে।

চোখে চোখে তাকিয়ে হেসেছিলো বোকার মতো।

কি ?

না, কিছু না।

হাসলে যে ?

এমনি।

একটু থেমে, কি ভেবে আবার শুধিয়েছিলো,

যাচ্ছো তাহলে ?

হ্যাঁ, কী লাভ থেকে, বাবা নিতে এসেছেন।

কবে ফিরবে ?

কবে, একটু চিন্তা হয়েছিলো তখন। কবে ফিরবো ? তাইতো, কবে ফিরবো। বলা যায়নি। তখন বলা যেতো না। বলেছিলাম, না ফিরবো না। মানে ? রেগে উঠেছিলো তখন। এতো ছেলেমানুষ, একটুতেই ভীষণ রেগে যায়! চোখ লাল হয়ে ওঠে। কালো মুখে রক্ত উঠে আরো কালো হয়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি মারবে। কিন্তু ঐ রাগই বা আর কতোক্ষণ। যখন ডাকলাম।

এই, রেগেছো ?

না।

না মানে, দিব্যি দেখছি রেগেছো।

আমার রাগ হলেই বা কার কি।

আচ্ছা, হাসি পাচ্ছিলো আমার তখন, তুমি কী বলো তো ? আমি কি মিছে কথা বললাম ?

মিছে নয় ?

না মিছে নয়। কেউ বলতে পারে, কি হবে দু'দিন পর! চারদিককার

যা অবস্থা। অবস্থা যদি এ-রকমই থেকে যায়, বাবা তা'হলে কি আসতে দেবেন?

দূরে কোথায় যেন শ্লোগান হচ্ছিলো। শুধোলাম, হাঁটবে একটু?

হাঁটলাম তখন, পাশাপাশি। আমি চলে যাবো, কতদিনে যে ইউনিভারসিটি খুলবে, কে জানে। সরকারের যা মারমুখী চেহারা। যখন তখন মিছিলের ওপর গুলি চালাচ্ছে। একটু মায়াদয়া নেই। এদিকে আবার শোনা যাচ্ছে প্লেনভর্তি সৈন্য আসছে পশ্চিম দিক থেকে। কী যে হবে!

এই, আবার ডাকলাম, কি হবে বলো না? একেক সময় এতো ভয় লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে, ভয়ানক কিছু একটা হবে– বলো না কি হবে?

কে জানে, বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেললো সে দূরের দিকে। বললো, ভয়ানক কিছু হবে হয়তো।

কিন্তু ঐ যে শোনা যাচ্ছে আপোস হবে।

কে জানে—অস্পষ্ট উত্তর। ভ্রূ কুঁচকে উঠলো ঈষৎ। মনে হলো কি যেন বলতে চাইছে। অপেক্ষা করলাম। শুধোলাম, কি ভাবছো?

কিন্তু কিছুই বলতে চাইলো না। ওর ও-রকম হয়। এক সময় আবার নিজের থেকেই সাতকাণ্ড কথা বলতে আরম্ভ করে দেবে।

হাঁটতে হাঁটতে আর্ট কলেজের গেট ছাড়িয়েছি। এসেছি শাহবাগের মুখোমুখি। আর তক্ষুণি একখানা আর্মি ভ্যান গাঁ গাঁ করে ছুটে গেলো পাশ দিয়ে—ভেতরে হেলমেট আঁটা সৈন্য, রাইফেল উঁচিয়ে আছে বাইরের দিকে।

ওটা চলে যেতেই আরো দু'টো ভ্যান গেল পর পর। আর সেই সময় হঠাৎ কোত্থেকে একটা রিক্সা এসে দাঁড়ালো পাশে। রিক্সঅলা জানালো, সা'ব বাড়ি যান গিয়া, গুলি চলছে মিছিলের উপর। ফের কার্ফু হইতে পারে।

এবার চঞ্চল হলো সে। বললো, আর নয়, এবার ফেরা যাক। চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই।

রিক্সায় উঠিনি। হেঁটে ফিরবো, আরেকটু সময় পাওয়া যাবে তা'হলে। ওকে আরেকটু কাছে পাবো।

কিন্তু ফেরার পথে কথা হলো না। গেটের কাছে এসে বললো, আমি চলি। আমি হাত ধরলাম এবার। গেটের কাছে দারোয়ান রয়েছে—কিন্তু

তবু সঙ্কোচ হলো না। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ইচেছ হলো একটা চুমু দিই কপালে। ও তাকিয়ে রইলো আমার দু'চোখের ভেতরে। চোখ দু'টো ওর এতো কালো, যেন তল পাওয়া যায় না।

শোনো, ডাকলাম। বললাম, তুমিও দেশে চলে যাও। কী লাভ এখানে থেকে। তুমি ভেবো না, পরীক্ষার পাট চুকে গেলেই আমাদের ব্যাপারটা আম্মাকে বলবো। তুমি শুধু সাবধানে থেকো, ভালো থেকো।

ওর দু'চোখ আরো গভীর হয়ে উঠেছিলো তখন। হাসছিলো মৃদু—বোধহয় চুমু খাবার সাধ হয়েছিলো সেই মুহূর্তে। আমি তখন ওর হাত ছেড়ে গেটের কাছে চলে এসেছি। ও নিউমার্কেটের রাস্তা ধরলো। ফিরে ফিরে তাকালো কয়েকবার। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখলাম, আমার ভালোবাসা চলে যাচেছ। যতোক্ষণ দেখা গেলো, ততক্ষণ দেখলাম। দেখতে আমার ভালো লাগছিলো।

হ্যাঁ, এই জায়গাই তো। এখানেই, এই গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম দু'জনে। কী গাছ এটা? জারুল? নাকি অন্য কিছু? কে জানে। এখানে আমি আর আমার ভালোবাসা দাঁড়িয়েছিলাম।

এইখানে আমরা বসেছিলাম। এই বেঞ্চটাতে। সেই দুপুর বেলায়। ও বেদম হাসছিলো। হাসির হো হো শব্দে দুটি বাচচা দেখতে এসেছিলো, কে হাসে অমন। আর ছেলে দু'টিকে দেখে ওর বেসামাল হাসি আরো ফেটে পড়ছিলো।

ধমকে উঠেছিলাম, পাগলের মতো হাসছো কেন?

হাসবো না, হাসি থামিয়ে বলেছিলো, এরপরও যদি না হাসি তাহলে কখন হাসবো। বিলকিস আর গোপা গিয়ে দেখবে তুমিও নেই, আমিও নেই। বসে বসে ঐ অখাদ্য সিনেমাটা দেখতে হবে। বেচারা। মিছিমিছি টাকাগুলো নষ্ট।

কাজটা আমারই। এতো ফাজিল মেয়ে হয়েছে ওরা। সর্বক্ষণ আমার পেছনে লেগে আছে। ওদের ধারণা আমরা হোটেলের বিছানায় দুপুর কাটাই। সিনেমা হলে নেকিং করি আর রেস্তোরাঁর কেবিনে চুমু খাই। সেই থেকে চোখে চোখে রাখে। খোঁজে সিনেমার টিকিট কোথায় লুকিয়ে রাখি। বেরুবার সময় জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছিস। ফিরলে শুধোয়, কেমন কাটালি

দুপুরটা, যা স্নান কর গিয়ে, ভালো লাগবে—এই সব যতো ইতর ফাজলামী ওদের।

শেষে মাহমুদের বুদ্ধিতে দু'খানা টিকেট কেনা হলো—সে এক অখাদ্য সিনেমা। সেই টিকিট আমার ড্রয়ারে দেখতে পেয়ে ওরাও মহানন্দে কিনে আনলো টিকিট। তারপর যেদিন আমি বেরুলাম, সেদিন আমার পিছু পিছু ওরাও বেরিয়ে পড়লো। আমরা সিনেমা হলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ওরাও ঠিক পৌঁছে গেলো সময় মতো। মুখোমুখি হলে এমন ভাব দেখালো যেন চেনেই না। একেবারে গট গট করে ঢুকে গেলো সিনেমা দেখতে। আর সেই থেকে হাসি মাহমুদের। সিনেমার টিকিট দু'টো বিক্রি করে চলে এলাম পার্কে। ধারণা ছিলো, দুপুরের চড়া রোদে পার্ক নিশ্চয়ই নির্জন হবে। নির্জন ছিলোও, কিন্তু যা পাগলের মতো হাসতে আরম্ভ করেছে—দুপুরটাই মাটি।

হ্যাঁ, হাসি থেমেছিলো মাহমুদের। শেষে গম্ভীর হয়ে উঠেছিলো একেবারে। রাজনীতির জটিলতা ব্যাখ্যা করেছিলো তারপর। না, নিজের কথা বলতো না কখনো। কখনো বাড়ির কথা এসে গেলেও পাশ কাটাতো। বলতো, তোমাকে বলবো কেন, বলবার সময় হলে তোমার বাপকে বলবো।

আমার ভারী ইচেছ করতো ওর মা'র কথা বলুক। একেকদিন ভারী সুন্দর করে ও মা'র কথা বলতো। ওর মা'র ইস্কুল, বাসায় একাকী বারান্দায় বসে থাকা। ক্রুসের কাজে ভীষণ নেশা—হ্যাঁ, আর বই পড়তে ভালোবাসেন। হার্ডি পড়েন শুধু, হার্ডি আর শরৎচন্দ্র। হ্যাঁ, গানও গেয়ে ওঠেন—আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।

আমার অমন মা নেই। অমন মা কারো হয় না। আমার ভীষণ দেখতে ইচেছ করতো। শুনতে ইচ্ছে করতো। শুধোতাম, মা'র চিঠি এসেছে? সুন্দর চিঠি লেখেন ওর মা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখেন প্রকাণ্ড নির্জনতার কথা, লেখেন বাড়ির গাছগুলোর কথা, ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটলো না কেন, সেই কথাও থাকে। আরো থাকে পাখির কথা, রাতে দেখা স্বপ্নের কথা, কখনো কখনো বই-এর কথা। আর সব চিঠিতেই তাঁর স্মৃতি অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে—যেখানে কখনো শিশু মাহমুদ, কখনো বালক মাহমুদ আর কখনো বা কিশোর মাহমুদের ছবি। আমার ভীষণ ভালো লাগতো। সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে বাচ্চা বয়সে ওর থুঁতনি কেটে গিয়েছিলো আমি দেখেছি ওর

সেই দাগ এখনো আছে। ওর শরীরে বুকের কাছে বাঁদিকে লাল জরুলের চিহ্ন আছে—সেও ঐ চিঠিতেই পড়া। আমি চোখে দেখি নি। ঐ চিঠিতেই মাহমুদকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। মায়ের চিঠি পড়তে তাই আমার ভালো লাগতো।

আর এই যে এখানে রাস্তা, এই পথ, এই পথ দিয়ে আমরা হাঁটতাম। ও হাঁটতো মাথা উঁচু করে। শুকনো চুল উড়তো বাতাসে। ভারী অবাধ্য চুল ছিলো ওর। কোনো মতে বশে থাকতো না। কতোদিন বলতাম ক্রীম লাগাও চুলে। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

এই রাস্তায় রোজ হাঁটতাম আমরা। গাছের ছায়ায় নিবিড় রাস্তা। একদিন কাঠবেড়ালী দেখেছিলাম একটা। ও রাস্তার মাঝখানে ঢিল কুড়িয়ে কাঠবেড়ালীটার দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলো। একদিন, সেদিন বোধহয় একটা মিছিল যাচ্ছিলো পাশ দিয়ে, আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম গাছতলায়। ও ভালোবাসার কথা বলছিলো, তখন। বলছিলো, সব সময় তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে। আমার একাকী থাকতে একটুও ভালো লাগে না।

কী স্পষ্ট গলায় কথা বলতো, যখন একাকী হতাম, ভেবে আমার অবাক লাগতো। একটু সঙ্কোচ নেই, একটু লজ্জা নেই। স্থান নেই, অ-স্থান নেই, সোজাসুজি কথা বলে বসতো। একদিন এই রাস্তায় আমরা ঝগড়া করেছিলাম। তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিলো দু'জনাতে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো একেবারে—কিন্তু তবু যদি ওর ভ্রূক্ষেপ থাকে। আমাকে যাচ্ছে-তাই বলে গালাগাল করেছিলো সেদিন। তারপরও এই রাস্তা দিয়ে আমরা য়ুনিভার্সিটি যেতাম। রাস্তায় দেখাও হতো। কিন্তু কথা হতো না। অনেকদিন ছিলো ঐ ঝগড়া।

এই মাঠ, জ্যোৎস্নারাতে হল থেকে পালিয়ে এখানে এসে বসতাম। কথা বলতাম এলোমেলো। শিশির জমতো ঘাসে। ফেরার পথে স্যাণ্ডেল শুদ্ধু পা ভিজে যেতো, চোরকাঁটায় ভর্তি হয়ে যেতো শাড়ির পাড়। হায়রে! দারোয়ান রোজ শাসাতো নালিশ করবে বলে। কিন্তু কখনো নালিশ করে নি। দারোয়ান ফিরে এসেছে—কিন্তু আমার মুখের দিকে আজকাল আর ও তাকায় না।

ওকে কোথাও খুঁজে পাই না। কেউ বলতে পারে না ওর খবর। আহসান বলে—শেষ দেখা গেছে ওকে খালি গায়ে কালো প্যাণ্ট পরনে—ইকবাল হলের পাশে রাইফেল হাতে পজিশন নিয়েছিলো।

না, লাশ কেউ দেখে নি।

হরিপদ বলে—না, ওকে দেখি নি লাশগুলো পুঁতে দেয়ার সময়। তবে জগন্নাথ হলে একবার দেখেছিলাম সন্ধ্যেবেলা।

জাহিদ খোঁজ দিয়েছে—অন্ধকার রাতে ও বেরিয়ে পড়েছিলো রাইফেল হাতে নিয়ে। যাবার সময় শুধু বলেছিলো, না এভাবে মরার কোনো মানে হয় না।

দারোয়ান বলে, জী, চিনতাম মাহমুদ সাহেবকে। ঐদিন হলেই ছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে, বলেছিলেন, পালিয়ে যাও দেরী ক'রো না। আমি তক্ষুণি হল ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম—পরের খবর জানি না।

কিন্তু আমি কী করি! একবার মনে হয়, এখানে এই রাস্তার ওপর দিয়ে বোধহয় ওর লাশ টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। একবার মনে হয়, বোধ হয় এই গাছতলায়—কখনো আবার মনে হয়, বুঝি এখানে, এই মাঠের পাশে আছে ও! আমি কখনো মাঠের পাশে এসে দাঁড়াই, কখনো আস্তে পা ফেলে হাঁটি, কখনো আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি জারুল গাছের ছায়ায়। একেক সময় মনে হয়, কেউ যেন আমাকে ডাক দেবে। মনে হয়, আমার ভালোবাসা যেন পেছন থেকে ডেকে উঠবে! মনে হয়, চারদিকের এই ভীষণ রোদ, প্রকাণ্ড দুপুর আর বিধ্বস্ত চরাচরের মাঝখান থেকে আমার জীবন বোধহয় হঠাৎ জেগে উঠবে কোথাও।

মানুষের শরীর থেকে প্রাণ চলে গেলে—লাশ থাকে। লাশ পচে গেলে থাকে হাড়গোড়, সেই হাড়গোড়ও হারিয়ে গেলে আর কী থাকে? বলো, আরো কী থাকে? কেন আমাকে ফিরে ফিরে আসতে হয় তবে?

কপিলদাস মুর্মুর শেষ কাজ

বাতাস উঠলে এখন টাঙনের পানিতে কাঁপন লাগে না। পানি এখন অনেক নীচে। বালি কেটে কেটে ভারী ধীর স্রোতে এখন শীতের টাঙন বয়ে যায়। পানির তলায় বালি চিকমিক করে, কোথাও কোথাও সবুজ গুল্ম স্রোতের ভেতরে ভাটির দিকে মাথা রেখে এপাশ ওপাশ ফেরে। চতুর দু'-একটা মাছ তির তির করে উজানে ছুটে গেলেও আবার ভাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু কাঁপে না পানির স্রোত। এমনকি সাঁকোর ওপর দিয়ে চিনি কলের ভারী আখ-বওয়া ট্রাকগুলো যাবার সময়ও না। সাঁকোর থামগুলো গুম গুম শব্দ করে ওঠে, কিন্তু পানির স্রোত তেমনি ধীর, তেমনি শান্ত। আসমান কান্দর আর দিগন্ত জুড়ে যে শীতের একটা শান্ত ভাব থাকবার কথা সেই ভাবটা টাঙনের স্রোতে আজকাল সব সময় ধরা থাকে।

আর ঐ শান্ত নদীর ধারে বসে থাকবার জন্যেই কিনা কে জানে কপিলদাস ভারী আরামে রোদের দিকে পিঠ মেলে দিয়ে ঝিমোতে পারে। তার চারদিকে নানা শব্দ কিন্তু সে সব তার কানে ঢোকে কি না বোঝা মুশকিল। ধরো, কী রকম গাঁ গাঁ চিৎকার করতে করতে চিনি কলের ট্রাকগুলো ছুটছে, ফার্মের ভেতরে বিনোদ মিস্তিরি খান-দুই ট্রাক্টর ট্রায়ালের জন্য চালু করে রেখেছে—তার ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দ একটানা সকাল দুপুর রাত ধরে ক্রমাগত হয়ে চলেছে, নদীর ওপারে আবার কোথায় এক রাখাল সারাদিন ধরে একটা বুনো সুর বাঁশিতে বাজিয়ে যাচ্ছে—এ সবই তার কানে ঢুকবার কথা। কিন্তু কপিলদাস চুপচাপ। মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে অল্প-স্বল্প দুলছে, আর সে বসে রয়েছে তো বসেই রয়েছে।

ওদিকে ছাগল ঢুকে যদি সব্জি ক্ষেত তছনছ করে, কি বিন্দা মাঝির বউ সোনামুখী নগেন হোরোর বোন সিলভীর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধায় কিম্বা নদীর ওপারে খোলা কান্দরে খরগোশ তাড়িয়ে নিয়ে আসে কোনো ভিন গাঁয়ের কুকুর এবং সেজন্যে যদি এপারের বাচচারা লে লে হৈ হৈ করেও ওঠে—কপিলদাস নড়বে না, হেলবে না, কান পাতবে না—কাউকে একটা কথা জিজ্ঞেসও করবে না।

আসলে কপিলদাস বুড়োর কাছে সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো বলে মনে হয়। মনে হয়, এরকমই হয়ে আসছে দুনিয়ায়। ঝগড়া বলো, ঝাঁটি বলো, জন্ম বলো, মরণ বলো- সবই একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো। কতো দেখলো সে জীবনে। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে মিলে যায়। রাগ বলো, ক্ষোভ বলো, আবার হাসিখুশি মনের ভাব বলো, কিম্বা সামনে প্রকাণ্ড কান্দর, কি কান্দরের ওপরকার আসমান, আবার তার নীচে টাঙনের স্রোত—সব কিছু, যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যা শোনা যাচ্ছে—সবই একটার সঙ্গে আরেকটা শেষ পর্যন্ত মেলানো। আসলে, তার মনে হয়, সংসারের অনেক ভেতরে শান্ত ধীর এবং নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোত আছে। সব কিছুর ওপর দিয়ে ঐ স্রোত বয়ে যায়। সেখানে কাঁপন নেই, উত্তেজনা নেই, চিৎকার নেই। সব কিছু সেখানে ক্রমাগত একটার সঙ্গে আরেকটা মেলানো।

ঠিক এই ধরনের একটা গা-ছাড়া পরিতৃপ্ত ভাব আজকাল তাকে প্রায়ই পেয়ে বসে। আর সেজন্যেই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ভারী আরামে সে ঝিমোতে পারে। বয়স বেড়ে গেলে সম্ভবতঃ মানুষের এরকম একটা অবস্থা এসে যায়।

তবে সব সময় ঐ ভাবটা থাকে না।

মাঝে মঝে ঐ রকম ঝিমোতে ঝিমোতে সে হঠাৎ আবার জেগেও ওঠে। তখন নগেন হোরোর বোন সিলভীর চিৎকার, মহিন্দরের ছেলের খরগোশ শিকার, কি ম্যানেজার মহাজনের দুর্ব্যবহার—এই সব ঘটনা তার চোখে পড়ে যায় এবং একটু একটু উত্তেজনাও বোধ করে। আর আশ্চর্য লাগে তার। চারদিকে এতো কাণ্ড ঘটছে অথচ সে কোনো জায়গাতেই নেই—কোনো কিছুতেই সে জড়াচ্ছে না। ভাবো তো কি কাণ্ড! কপিলদাস কি এই রকম ছিলো? নিজেকেই জিজ্ঞেস করে সে, কপিলদাস, এই রকম ছিলি তুই?

স্মৃতির সদ্ব্যবহার

আর তখনই পুরনো ঘটনা ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিয়ে আসে চোখের সামনে। পুশনা পরবে কি তুমুল নাচ জুড়েছে দেখো কপিলদাস। তার গলায় বাঁধা মান্দল কী রকম শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, মেয়েদের গলায় কেমন শানানো স্বর। কপিলদাস দেখতে দেখতে নিজের যৌবনকালে চলে যায়। একের পর এক ঘটনা মনে পড়তে থাকে তার। আর ঐ রকম ভাবে স্মৃতি

তার সামনে পুরনো পসরা খুলে বসলে সে ভারী সুখে ঐসব পুরনো ঘটনার মধ্যে বিচরণ করে ফেরে।

একবার সেই যে কি হলো, মহাজনের ধান খামার বাড়ি থেকেই কিষাণদের হাতে বিলিয়ে দিলি—মনে আছে সে কথা ?

আর মানুয়েল পাদ্রীকে টাঙনের পানিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলি ? মনে নাই ?

চকিতে সে দেখতে পায় বর্ষায় ভরা টাঙনের পানিতে পাদ্রী তলিয়ে গেলো। ঘোলাটে পানির মধ্যে কালো জুতো শুদ্ধু তার পা দুখানি ওপরে উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেলো স্পষ্ট করে। একটু পরই মানুয়েল পাদ্রী আবার ভেসে উঠেছিলো। আর সে কি গাল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে শাসাচ্ছিলো, দেখিস তোর বাপকে বলবো, দেখবো বিচার হয় কি না।

সেই ছেলেবেলার কথা। হাপন ছিলো যখন সে। তোর তীর কী রকম নিখুঁত নিশানায় গিয়ে বিঁধতো, কপিলদাস মনে নাই সে কথা ?

হঁা মনে আছে। কপিলদাস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকে শোনায়—সব মনে আছে।

কেন মনে থাকবে না। সান্তালের বাচচা না সে ? দেখো তো খরগোশের পেছনে কে ছুটছে অমন ? শুকদেবের ব্যাটা চতুর মাঝি নাকি দিবোদাসের ব্যাটা কপিলদাস ? আর ঐ দেখো, কপিলদাসের শিকারী কুকুর কী রকম ছুটে যাচ্ছে তীর-খাওয়া শিকারের পেছনে। কপিলদাস মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায় তার কালো রঙের কুকুরটাকে—যেটা তার কিশোরকালের সঙ্গী ছিলো সর্বক্ষণ। কুকুরটাকে শেষ পর্যন্ত বাঘে খেলো।

কপিলদাসের মনে কুকুরের শোক উথলে ওঠে। টুঁটি-ছেঁড়া রক্তাক্ত কুকুরটাকে সে মনের ভেতরে দেখে আর কাঁদে।

একেক সময় আবার হাসেও কপিলদাস। ভারী প্রসন্ন হাসিতে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একেবারে। কেউ দেখে না, কিন্তু তবু বুড়ো হাসে। আহা কি দিন সে সব। সিনথিয়ার সঙ্গে দেখা হয় না, কপিলদাসের সদ্য যৌবনের রক্তে তখন ধিমি ধিমি তাত। বড় কষ্ট তখন মনের ভেতরে—কিছুই ভালো লাগেনা। ঐ সময় নগীপুরের হাটে দেখা হলো। কামার হাটির পেছনে, ধাঁই ধাঁই শব্দে লাল লোহার ওপরে হাতুড়ি পড়ছে আর

পাশে ভাঁটের ঝাড়—সেখানে ভাঁট ফুলের বুনো গন্ধ, সন্ধ্যারাতের চাঁদ পূব আকাশে। সাঁওতাল মেয়ের দুবাহু ময়াল সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরলো গলা। কালো চোখের পানিতে জ্যোৎস্নার আলো চিক্ চিক্ করে উঠেছিলো। তবু হাসছিলো সিনথিয়া। তার হাসি দেখে মন ভরে যাচ্ছিলো কপিলদাসের। সেই মন-ভরানো সুখের হাসিও বুকের ভেতর থেকে একেক সময় উঠে আসে।

কপিলদাস একেক দিন আবার নিজের কাছে গল্প ফাঁদে। দূর থেকে দেখা যায় বুড়ো থেকে থেকে মাথা নাড়াচ্ছে আর ঝুঁকে ঝুঁকে দুলছে। কোন গল্পটা আরম্ভ করবে সে? বাহ্ গল্পের কি আর শেষ আছে—নিজেকেই শোনায় বুড়ো। ধরো, মেলার সেই ঘটনাটা—

মেলার গল্পটাই হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়ে যায়। কেন যে বেছে বেছে মেলার গল্পটাই শুরু হয়—সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। গল্প আরম্ভ করলেই সে মেলার ঘটনায় চলে আসে।

ছাড়, ছাড়ে দে! বাহুর ভাঁজে চেপে ধরা গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ঘামের গন্ধ এবং ঐ রকম দম বন্ধ হয়ে আসা আওয়াজ—ভারী কৌতুকের বিষয় হয়ে ওঠে। কপিলদাস ঐ অবস্থাতেই মজা পেয়ে হেসে ওঠে এবং গলা চেপে ধরা বাম বাহুর হাতের মুঠো ডান হাতে ধরে একটু জোরে চাপ দেয়। আর ঐ রকম চাপ দিতেই লোকটা আ—হ্ শব্দ করে আর্তনাদ করে ওঠে। তার দু'চোখে ভয়ানক বিভ্রান্ত ঘোলাটে দৃষ্টি। ঐ আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় লোকটার গলাটা বোধ হয় মটাৎ করে ভেঙে গেলো। অতো বড় শরীর, কিন্তু পা দু'খানা কেমন শ্লথ হয়ে মাটি থেকে আলগা হয়ে যায়। আর তাতে উল্টো বিপদ হয়। ঐ রকম বিশাল শরীরের পুরো ভারটা এসে পড়ে নিজের ওপর। কি মুশকিল, কপিলদাস কি করবে তখন বুঝতে পারে না। লোকটার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার শব্দে ভারী খারাপ লাগতে আরম্ভ করে এক সময়। ওদিকে একটা নাগরদোলা লোকসুদ্ধু ভয়ানক বন বন করে ঘুরছে দেখতে পায়। শুনতে পায় কলের গান বাজছে—ফান্দেহ পড়িয়া বগা কান্দেহ রে-এ-এ এ—নিজেকে তখন অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয় সে বোধ হয় মেলার মাঝখানে নেই। ঐ রকম অবস্থায় চারদিকের লোকজন তাকে ছাড়িয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কপিলদাস দূর থেকে পেছনে তাকালে

দেখতে পায়, লোকটা মাথা নীচু করে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।

কেন যে ঐ রকম মারামারির কাণ্ডটা ঘটেছিলো ঠিক মনে করতে পারে না। শুধু লোকটার মুখ মনের ভেতরে দেখতে পায়। লোকটার নাম কি, বাড়ী কোথায়, কোন প্রসঙ্গে ঐ রকম ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো কিছু মনে আসে না।

কিম্বা ঐ ধান কাটার ব্যাপারটাই ধরো না কেন। আধিয়ার জোতদারের মাঝখানে পড়ে গেল সাঁওতাল বস্তিটা। গুপীনাথ হুঁ হাঁ করে না, ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় না। ওদিকে কে একজন আগুনের কুণ্ডলীর ওপরে আরেক বোঝা নাড়া চাপিয়ে দিয়ে গেলো। দাউ দাউ করে জলে উঠলো আগুন। আর ঐ আগুনের আলোয় গুপীনাথের কপাল চকচক করতে লাগলো। কিন্তু সে শাদা চুল ভর্তি মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে।

কপিলদাসের ঘাড়ের কাছে শীতের বাতাস শিরশির করে এসে লাগছিলো। আগুন দেখতে পেলে শীতের কামড়টা বোধ হয় বেশী লাগে। নইলে হঠাৎ ঐ সময়ই বা কেন কানের কাছ দিয়ে, ঘাড়ের কাছ দিয়ে, শিরশির শিরশির করে শীত তার শরীরে ঢুকে ক্রমাগত ছড়িয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু বুড়োর কাণ্ডখানা দেখো, হুঁ হাঁ করে না। বলে দেয় না, ডাইনে যেতে হবে, না বাঁয়ে। একদিকে জোতদার মহাজন আর অন্যদিকে আধিয়ার কিষাণ। ওদিকে আবার কুয়াশার নীচে পাকা ধান শুয়ে আছে যুবতী মেয়ের মতো। কুন দিক যাবে মানুষ--হাঁ মড়ল, কহে দে, কুন দিক যাবে।

কিন্তু গুপীনাথ সাড়া দেয় না—যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছে কি না বোঝা দায়।

সাঁওতালদের তখন কি মুশকিল ভাবো দেখি। মহাজন বসত করবার জায়গা দেয়, আবাদের জমি দেয়, গিরস্তির কাজ দেয়—সেই মহাজনের বিপক্ষে কেমন করে যায়। মহাজন যে সব দেয়। হাঁ, সব দেয়—কিন্তুক পেটের ভাতটা কি সারা বছর দেয়, আঁ? কহ মড়ল, কহে দে, দেয় পেটের ভাতটা? এই রকমের সব বাদানুবাদ। কিন্তুক যদি ভিটেমাটি থেকে তুলে দেয় তাহলে? এই রকমের সব তর্কাতর্কি। ওদিকে গুপীনাথ কিছুই বলে না। মড়ল হলে বোধ হয় ঐ অবস্থায় কিছু বলা যায় না।

কিন্তুক তখন ভারী জাড় হে মড়ল। দেহ দলদল করে কাঁপছে। দূরে দূরে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলো—হামরা মাহাজনের সঙ্গে নাই, আধিয়ার কিষাণের সঙ্গে হামরা।

কে বলেছিলো কথাটা? মনে নেই এখন। সে নিজে হতে পারে, মোহন কিস্কু হতে পারে—কিম্বা চতুর মাঝিও হতে পারে। লোকটা যে কে ঠিক মনে নেই। কিন্তু কথাটা ঠিক মনে আছে।

তারপর?

✓ শিমুররঙ

কপিলদাস আর খেই ধরতে পারে না। বিচার সভার শেষ দৃশ্যটা স্মরণে আসে না। বরং হঠাৎ ধান কাটার দৃশ্যটা মনের ভেতরে দেখতে পায় সে। কপিলদাস মাঠে নেমেছে, পাশের ক্ষেতে মোহন কিস্কুর বউ টুরি—সারা কান্দরে আর একটা মানুষ দেখা যায় না। ধান গাছের নোয়ানো পাতায়, শিষের গায়ে, তখনও রাতের হিম ফোঁটায় ফোঁটায় জমে আছে। রোদের তাপ গায়ে লাগে কি লাগে না এমনি কুয়াশা।

হঠাৎ পাশে অস্ফুট আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকালো সে। দেখলো, টুরি মাঝিন হাতের কাচিয়া ফেলে তার বিশাল পেট দু'হাতে চেপে ধরে বসে পড়েছে। কপিলদাস চিৎকার করে লোকজন ডাকাডাকি করলো। কাছাকাছি একটি মানুষ নাই হে তখন—ভাবো তো কি বিপদ। সে নিজে এগিয়ে গেলে সে কি গালাগাল টুরির। ঐ গালাগাল শুনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। আর ঐ রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো টুরি একটু পরই উঠে দাঁড়াচ্ছে। মেয়েটা তারপর টলমল পায়ে হেঁটে হেঁটে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেলো।

পুরুষ মানুষ আসলে নিষ্কর্মা। কপিলদাস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজেকেই শুধোয়, বলো নিষ্কর্মা নয়? জন্মের সময়টাতে তার করবার কিছু নেই। সে শুধু বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকতে পারে।

ঐ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে টুরির কাতরানি শুনেছিলো। মেয়েমানুষের ঐ চাপা অথচ মর্মভেদী আর্তনাদের সঙ্গে বোধহয় আর কিছুর তুলনা হয় না। ওহ্ সে কি কষ্টকর ঐ রকম আর্তনাদ শোনা। তার একটু পরই সদ্যোজাত বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়ে তার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে খুশি জেগে উঠেছিলো। ছুটে গিয়েছিলো তখন ঝোপটার দিকে। হ্যাঁ, ঝোপটাকে সে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায়। কাঁশঝাড় ছিলো, একটা

নাটার গাছ ছিলো, আবার কয়েকটা আঁশ শ্যাওড়ার গাছও দেখা যাচ্ছিলো। সেখানে আবার একটা সাপের খোলসও ছিলো। আঁশ শ্যাওড়ার ডাল থেকে নাটা গাছের কাঁটাভর্তি ডাল পর্যন্ত লম্বা করে টানানো। সেই খোলসটার ওপর আবার রোদ এসে পড়েছিলো তখন। আর ঐসব দেখতে দেখতে, হ্যাঁ ভারী মনোযোগের সঙ্গে দেখতে দেখতে মাথা উঁচু করে সে তাকিয়েছিলো।

ভারী আশ্চর্য সেই দৃশ্য। সদ্যোজাত শিশুর নাড় দাঁত দিয়ে কাটছে মা। বাচচাটা থেকে থেকেই চিৎকার করে উঠছিলো। সদ্যোজাত বাচচার কান্না কিন্তু অদ্ভুত। অদ্ভুত নয়? কেমন অঁা অঁা করে শরীরের সমস্ত নিঃশ্বাস বার করে দেয় গলা দিয়ে তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে হিক্কা তোলার মতো দেহ কাঁপিয়ে দমকে দমকে কাঁদতে থাকে। ঐ রকম কান্না শুনেও মা কিন্তু কিছু বলছিলো না। কে জানে ঐরকম সময়ে মায়েরা বাচচার কান্না শুনতে পায় কি পায় না। হ্যাঁ, মা কিছুই বলছিলো না। কোন সোহাগের কথা মায়ের মুখে ফুটছিলো না। তাই দেখে সে মনে মনে কিছুটা উত্তেজনা বোধ করছিলো। কিন্তু তখন মা ভয়ানক ব্যস্ত না? তার তখন বাচচার কান্না শোনবার মত সময় কোথায়? বলো, অতদিক তখন নজর দিতে পারে?

হ্যা, দেখছিলো সে, মায়ের নিজের শরীর একদিকে আরেকদিকে সন্তান। নিজের উর্ধ্বাঙ্গের কাপড় সন্তানের গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন। আহা, হাত দু'খানি কি শান্ত, কি কোমল – কব্জির ভাঁজটুকু কিম্বা আঙুলের নড়াচড়াটুকু টাঙনের মোলায়েম ঢেউয়ের মতো মনে হচ্ছিলো। নিজের অনাবৃত বক্ষদেশ নিয়ে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কপিলদাস এখনো স্পষ্ট দেখতে পায় দুধে স্ফীত সাঁওতাল মায়ের বুক কী রকম নিঃসঙ্কোচ হতে পারে। বোঁটা দু'টি, বোঁটা দুটির চার পাশে কালো ঘেরটুকু পর্যন্ত ভারী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। শুধু মায়ের বক্ষদেশ নয়— নিম্নাঙ্গের কাপড়ও কী রকম রক্তাপ্লুত তাও সে দেখতে পাচ্ছিলো। কালো শরীরে শাদা কাপড় এবং শাদা কাপড়ের ওপর আবার ঐরকম ডগডগে লাল রক্ত—সেও সবুজ ঘাসের মাঝখানে। সকাল বেলার রোদে গোটা দৃশ্যটা ভয়ানক জ্বল জ্বল করছিলো তার চোখের সামনে। তারপর যখন সে বাচচাটাকে কোলে তুলে নিলো—আহা—সে যে কী রকম একটা ভাব, সে বলে বোঝাতে পারবে না। বাতাসে পাকা ধানের গন্ধ, তার নীচে ভেজা মাটির গন্ধ এবং তারো নীচ থেকে যেন নবজাত

শিশুর গন্ধ উঠে আসছিলো । আর ঐ সময় তার দু'হাতের মধ্যে ধরা ঐ রকম রক্তাক্ত কোমল একটি লাল ফুল ।

বাচ্চাটা লাল মুখ মেলে চিৎকার করে উঠছিলো । তার মাড়ি, জিভ, কুঁচকানো নাক, পিটপিটে চোখ দু'টি এখনো সে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায় । আর হ্যাঁ, হাঁটতে হাঁটতে ঐ সময় সে দু'হাতে বাচ্চাটাকে দোলাচ্ছিলো ।

কপিলদাস বুড়ো বসে বসেই হাত দু'খানা তুলে শূন্যে দোলাতে আরম্ভ করে ।

ঐ রকম গল্প বলতে বলতে বেলা ফুরিয়ে যায় এক সময় । রোদের তাপ কমে আসে । ঝাপসা চোখ দুটি মেলে সে তখন আসমানের ধূসর রঙ দেখে । একবার নদীর ভাটি থেকে উঠে আসা শঙ্খ চিলের ডাকটাও শুনতে পায় । বাতাসে তখন শীতের কামড় । তার দু'হাতের আঙুল ছেঁড়া কোটের বোতাম দু'টি খুঁজতে থাকে ।

আর ঐ সময়ই তার চোখে পড়ে যায় । দেখে ক'জন লোক টাঙনের উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন দেখাচ্ছে । লোকগুলোকে সে চিনতে চেষ্টা করে । ওখানে এই সময়ে কারা ? অমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা—কে লোকটা ? অনেকক্ষণ ধরে লোকটার নড়াচড়ার ভঙ্গীটা লক্ষ্য করে । লক্ষ্য করতে করতেই মনে পড়ে—ক'দিন আগেও বোধহয় ওদের এইভাবেই দেখেছে সে । ঠিক এইভাবেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বস্তির দিকে হাত তুলে কী যেন বলাবলি করছিলো । সে এক সময় চিনতে পারে । পরিষ্কার জামা-কাপড় পরা লোকটা ম্যানেজার মহাজন ছাড়া আর অন্য কেউ হতে পারে না । কিন্তু এমন সময় ওখানে দাঁড়িয়ে ওদের কি কাজ ? একবার মনে হয় জরিপ হচ্ছে বোধ হয় । একেক সময় ঐ রকম জমিজমার মাপামাপি চলে । ওরা কি জমিজমা মাপতে এসেছে ? কই এ রকম কোনো খবর তো তার কানে আসে নি ।

একটু পর আর দেখা যায় না কাউকে । দেখতে না পাওয়ায় কৌতূহলটাও আর থাকে না । কপিলদাস তখন গরুর পালের ঘরে ফেরা ঘুন্টির আওয়াজ কান পেতে শোনে । ফার্মের গরুগুলোর গলায় নতুন ঘুন্টি বাঁধা হয়েছে নিশ্চয়ই । আজকাল বোধহয় জয়হরির ছোট ছেলেটা ফার্মের গরু চরায় । জয়হরির কী যেন হয়েছিলো ? জয়হরির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করে

সে। আর ঠিক ঐ সময় কাছে এসে দাঁড়ায় সলিমউদ্দিন। এসেই ডাকে, বুঢ়া দাদা বাড়িত যাবো নাই ?

হঁ্যা যামু, সে জয়হরির কথা স্মরণ করতে না পেরে সলিমউদ্দিনের দিকে মনোযোগ দেয়। ছোঁড়া কোত্থেকে আসছে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে করতে উঠে দাঁড়ায়।

সলিমউদ্দিন তখন কুশিয়ার ক্ষেতে আজ কি কাণ্ডটা ঘটেছে সেই ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করে। এবং ঐ আরম্ভের মুখেই সে জানিয়ে দেয়— বুঢ়া দাদা তুমার বস্তিটা আর এইঠে থাকবে নাই, ইবছর এইঠে ধানের আবাদ হবে। কথাটা কেন যে বলে ছোঁড়া বুড়ো ঠিক ধরতে পারে না। কিম্বা এমনও হতে পারে যে তার বর্ণনাতেই বোধ হয় প্রসঙ্গটা থাকে না। সিলভী আজ বিন্দা মাঝির বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। কীভাবে, সেই ব্যাপারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে বর্ণনা করে। তারপর হঠাৎ বিন্দা মাঝি এসে গেলে কী হলো সেই পরিস্থিতিটাও সে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কপিলদাস হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়ায় আরেকবার। সিলভীর বাপের কথা স্মরণ হয় তার। সিলভীর বাপ গীর্জায় চলে গিয়েছিলো। তারপর কি একটা ব্যাপারে ঝগড়া করে ফিরেও এসেছিলো। শেষে কী যে হয়ে গেলো লোকটার, বাঁচলো না। পট করে একদিন মরে গেলো। হরগোবিন নাম ছিলো না লোকটার ? কবিরাজের হাট থেকে ফিরছিলো সেবার—হঁ্যা, এই রকম জায়গাতেই বোধ হয় ঘটেছিলো ব্যাপারটা। সে মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে। বর্ষাকালের ব্যাপার, মাটিতে ফাটল ধরেছিলো -- ওদিকে টাঙন তখন পাগল। মাটি ধসে পড়েছিলো হঠাৎ। তখন সন্ধ্যা, শিবনাথ বোষ্টম পুলের ওপর দাঁড়িয়ে তখন গান গাইছিলো। ঠিক ঐ সময়ে ঘটনাটা ঘটে। কপিলদাস পুরনো কালের এই সব খুঁটিনাটি ঘটনার কথা ভাবতে শুরু করে দেয়।

ওদিকে কিন্তু কানের কাছে গুনগুন করে সলিমউদ্দিন বলেই চলেছে— সিলভী তারপর কি কহিল জানিস বুঢ়া দাদা। বিন্দা মাঝিক কহিল, তুই ম্যানেজার মাহাজনের কুকুর। কুকুর কহা কি ঠিক—তুই কহ বুঢ়া দাদা ?

কুকুর বলেছে? কপিলদাস আবার দাঁড়িয়ে যায়। হরগোবিনের মেয়ে, নগেন হোরোর বোন, সিলভী, কুকুর বলেছে। অ, সলিমউদ্দিনের দিকে তার চিন্তা ফিরে আসে, কুকুর কহে দিলে, ক্যানে?

আহ্ হা। সলিমউদ্দিনকে আবার পুরোনো কথার খেই ধরতে হয়। বলে, আরে ঐ যে কহিনু বিন্দা মাঝি ম্যানেজার মাহাজনের ঘরের ভিতর থে বাহার হয়ে আসিল আর আসে ধমকালে, মারিবা চাহিল। ম্যানেজার মহাজনের সঙ্গে কি তখন বিন্দা ছিলো ? একটু আগে অস্পষ্ট দেখা লোকজনের মধ্যে বিন্দা মাঝি ছিলো কিনা সেই কথাটা স্মরণ করতে চাইলো বুড়ো।

সলিমউদ্দিনের বর্ণনা তখনো ফুরোয়ানি। বললো, সিলভীর কি তেজ, বাপ, মায়ামানুষ না ডাইন—এক্কেবারে দাও উঠালে মারবার তানে !

কপিলদাসকে এবার মনোযোগী হতে হয়—কি কহিলো ? দাও উঠালে মারবার তানে—কা'ক মারবার তানে ?

বিন্দা মাঝিক বাহে, বিন্দা মাঝিক।

অ, কপিলদাস মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে। হরগোবিনের মেয়ে সিলভীকে মনের ভেতরে স্পষ্ট দেখতে পায়। খুঁটি উপড়ে দিয়ে ও মেয়ে ছাগলের পালটাকে যখন আলের উপর দিয়ে হৈ হৈ হুস হুস করে তাড়াতে থাকে আর ছুটতে থাকে তখন তার শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখো। যদি পুরুষ মানুষ হও তো নজর ফেরাতে পারবে না। সিনথিয়া ছিলো ঐ রকম। কপিলদাস মুর্মু নজর ফেরাতে পারতো না। দেখো, ঐরকম মেয়ে সিলভী, সে-ই কিনা দা তুলে তেড়ে গিয়েছে বিন্দা মাঝির দিকে ! কি হইল্, তারপর কি হইল্ ?

প্রশ্নটা মুখ দিয়ে উচচারিত হয়, কিন্তু কৌতূহলটা আর থাকে না। দূরে দেখতে পায় ম্যানেজার মহাজন সম্ভবতঃ আবার এসে দাঁড়িয়েছে উঁচু পাড়ের ওপর। বস্তির দিকে হাত তুলে তুলে কি যেন দেখাচেছ। আর ঠিক ঐ সময় দেখো বাচচারা আবার শিকার করে ফিরছে—ঐ সাবনেরটি বোধহয় তার নাতি। তার কুকুরটাকে স্পষ্ট চেনা যায়।

সলিমউদ্দিন তখনো সিলভীর প্রসঙ্গ পালটায় না। কি কি সব বলতেই থাকে। সিলভীর ভাই নগেন হোরোর নাম করে। কেন যে—খেই ধরা মুশকিল। নাকি সলিমউদ্দিন সিলভীর সঙ্গে ইদিক-সেদিক কিছু একটা করছে ? কপিলদাসের হঠাৎ সন্দেহ হয়। তবে সলিমউদ্দিনের খিটখিটে হাড়-সর্বস্ব শুকনো চেহারাটা দেখে আবার মায়াও হয়। কিন্তু সান্তাল মেয়ের তো

সন্দেহ

শুধু পুরুষ মানুষ হলে চলে না। তার মরদ পুরুষ দরকার। সে ফস করে জিজ্ঞেস করে, হাঁ বাহে, পচই খাইছি কুনো দিন?

সলিমউদ্দিন বুড়োর কথায় হকচকিয়ে যায়। এ কী রকম বিদঘুটে প্রশ্ন। জবাব দেয়, না বুঢ়া দাদা, নিশা মোর সহ্য হয় না।

কপিলদাসের হঠাৎ খেয়াল হয় লোকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। এখুনি না দেখলো! মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উবে গেলো অতোগুলো মানুষ।

নাকি সে দেখে নি! তার কেবলি মতিভ্রম হতে থাকে। ইদিকে সলিমউদ্দিনের সেই খামারবাড়ীর ঘটনাটার বর্ণনা তখনো ফুরোয় নি। এখন অবশ্যি সিলভীর কথা বলছে না। কিন্তু ম্যানেজার মহাজনের কথাটা বলেই চলেছে। ম্যানেজার মহাজন, বিন্দা মাঝি, বিন্দা মাঝির বউও আবার ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে তার বর্ণনায়।

বিন্দা মাঝির মাউগটা বুঢ়া দাদা —হাঁ, বুঝালো নি, এক্কেবারে বেহায়া বাহে। হাসে কেমন, দেখলে তোর শরীল জ্বলে যাবে।

নাও বোঝো! এবার কপিলদাসের হাসি পায়! কোন কথা থেকে কোন কথায় এসে পড়লো। এরও তাহলে মাথায় দোষ আছে।

কিন্তু ম্যানেজার মাহাজন কি কহিল শুনবো? কহিল, আর নহে, তুমার বস্তিটা ইবার উঠায় দিবে, দুচার দিনের ভিতর এইঠে টাকটর চলিবে।

কপিলদাস দাঁড়িয়ে পড়ে কথাটা কানে ঢুকতেই। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আঁ, কি কহিলো?

সলিমউদ্দিন কথাটা আবার বলে। বিন্দা মাঝির বউ সোনামুখী ম্যানেজার মহাজনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর ঝগড়া হলো আর তারপরই ম্যানেজার মহাজন কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। কথাটা কিভাবে বলেছিলো সেইটাই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে চেষ্টা করে।

সলিমউদ্দিনের কথা শুনতে শুনতে সে চারদিকের অন্ধকারের দিকে নজর ফেরায়। শীতকালের অন্ধকার ভারী দ্রুত নামছে। নদীর ওপারে কান্দরের দিকে রাখালের ডাকাডাকি শব্দ মিইয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। ধোঁয়া ধোঁয়া মলিন কুয়াশা কালো হয়ে ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নেমে এসে একেবারে ঢেকে দিয়েছে ক্ষেত, গোহাল, মানুষ এবং বস্তিকে। চারদিকের ছড়ানো মানুষ এখন কাছাকাছি হচ্ছে, ঘরে ফিরছে সবাই। মানুষের যতো কথা সব এখন

একে একে উঠোনে উঠোনে গিয়ে জড়ো হচ্ছে! এখন কিছুক্ষণ আগুনের কুণ্ডলীর চারপাশে কথাগুলো ঝিন ঝিন স্বরে ঘোরাঘুরি করবে। তারপর সেটাও যাবে চুপ হয়ে। মানুষেরা তখন যার যার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। অন্ধকার আর শীত কি রকম অদ্ভুত জিনিস দেখো, মানুষকে তাড়িয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। অন্ধকার দেখে মন ভয় পায় আর শীত দেখে শরীর। কাণ্ডটা দেখো!

অন্ধকারের দৃশ্য দেখতে দেখতে একটুখানি দার্শনিক ভাবনা এসে যায় বুড়োর মনে। সলিমউদ্দিনের কথা প্রায় ভুলে যায় ঐ সময়। অতো যে খুঁটিনাটি বর্ণনা তার কিছুই কানে ঢোকে না। বিন্দা মাঝির বউ ম্যানেজারের ঘরে ঢুকেছিলো সেই দুপুরবেলা, সবাই যখন কুশিয়ার ক্ষেতে। তারপর কুশিয়ার ওজনের সময় বিকেল বেলা সবাই যখন খামার বাড়ী এলো, তখন দু'জনকে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখা গেলো। ঐ সময় হেসে হেসে মস্করা করে কী যেন বলছিলো বিন্দা মাঝির বউ, ম্যানেজারও তখন খুশি ছিলো, সিলভীর দিকে তাকিয়ে সেও সম্ভবত কিছু বলছিলো। ওদের ঐ রকম কাণ্ড দেখেই কিনা কে জানে, তীব্র চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে উঠেছিলো সিলভী। ম্যানেজার মহাজান ঐ গালাগাল শুনে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে এসেছিলো। উঠোনের মাঝখানে ওজনের কাঁটা পোঁতা ছিলো। নবীন বর্মণ আর আকালু পরামানিক কুশিয়ার মাপতে শুরু করে দিয়েছে তখন। বিন্দা মাঝিও কেন যে কথাটা বলতে গেলো ঐসময়। তার নেশা ছিলো তখনও। সে সিলভীকে ছিনাল বলে গাল দিয়ে উঠলো। আর ঐতে বিপদ হয়ে গেলো! সিলভী কুশিয়ার কাটা দা নিয়ে সাঁ করে ছুটে গেলো বিন্দা মাঝির দিকে। সিলভী অবশ্যি কিছু করতে পারে নি। তাই নাকি পারে। অতো লোকজন চারদিকে। ঐ কাণ্ডটা ঘটে যাবার পরে ম্যানেজার মহাজনের কি রাগ—এই মারে তো এই মারে। শেষে, মানে রাগটাগ যা দেখাবার দেখানো হয়ে গেলে, তার আসল কথাটা জানিয়ে দিলো সবাইকে।

সলিমউদ্দিন সম্ভবতঃ যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। কপিলদাস কিছুক্ষণ শুনেও ঠিক ধরতে পারে না কথাটা। তার কেবলি তখন মনে হচ্ছে ম্যানেজার মহাজন এই সন্ধ্যেবেলা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালোই বা কেন, আর কেনই বা ঐভাবে হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। বিন্দা

মাঝির বউ ম্যানেজারের সঙ্গে মস্করা করে কথা বলছিলো — এইটুকু শুধু তার মনের মধ্যে ধরা পড়ছিল। দৃশ্যটা সে মনের মধ্যে দেখতেও পাচ্ছিলো। ঐ সঙ্গে থেকে থেকে আবার সিলভিয়ার সঙ্গে সলিমউদ্দিনের ফষ্টি–নষ্টির কথা, অন্ধকারের কথা, ঠাণ্ডার কথা সব একসঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। এমন কি টুরির সদ্যোজাত বাচচাটাকে দুহাতে দোলাচ্ছিলো পর্যন্ত সে মনে মনে। হ্যাঁ, তারপর কি যেন? সে হঠাৎ শুধোলো, হাঁ কি কহছিলো ম্যানেজার মাহাজনের কথা, টাকটর কুনঠে চলিবে?

এতো কথার পর এই প্রশ্ন। সলিমউদ্দিন রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়। বলে, না বুঢ়া দাদা তোরঠে কুনো কথা কহা যায় না, কুনো কথা তোর ফম থাকে না।

সলিমউদ্দিনকে ক্ষুব্ধ হতে দেখে কপিলদাস বুড়ো ছোঁড়ার ঘাড়ে হাত রাখে। কি কপাল ছেলেটার দেখো, এই বয়সে মা-বাপ-ভাই-বোন চৌদ্দ গুষ্টি খেয়ে বসে আছে। একটা চাকরি ছিলো ফার্মে, ম্যানেজারের বউয়ের হুকুমে সেটিও গেছে। ছেলেটার রোগা দুর্বল শরীরে হাত রাখলে তার একেক সময় মায়া হয়। এখনো তাই হলো, বেচারা। সেই কখন থেকে ঘটনাটা বলে যাচ্ছে। কপিলদাস এবারে আন্তরিক আর মনোযোগী হয়। প্রায় মিনতি করে বলে, হাঁ বাপু তারপর কি হইল্ কহ তো? ম্যানেজার শালা কি কহিল?

আবার কথাটা নতুন করে বলতে হলো সলিমউদ্দিনকে। বললো, তুমার বসতটা ইবার উঠায় দিবে, এইঠে ইবছর টাকটর চলিবে।

কপিলদাস এবারও বুঝতে পারে না। তার নিজের হিসেব মেলে না। ট্রাক্টর জমিতে চলবে, তাই চলে এসেছে এতোকাল। মানুষের বসতের উপর দিয়ে ট্রাক্টর চলতে যাবে কেন? ই কেমন কথা? সে অন্ধকারেই ডাইনে বাঁয়ে তাকায়। বলে, ঠিক শুনিছিস তুই, কহ ঠিক শুনিছিস?

সলিমউদ্দিন এবার সত্যিই বিরক্ত হয়। বলে, মোর কথা বিশ্বাস না হয় আর কাহাকো পুছে দেখ। মুই ইবার যাঁউ, তুই বুঢ়া মানুষ, তোর কিছু ফম থাকে না।

কথাটা বলেই হঠাৎ ছোঁড়া চলে গেলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস বুড়োর ঠাণ্ডা লাগছিলো। কিন্তু সচল হবার কথাও তার মনে আসছিলো না। কথাটা কি ঠিক? কি কাণ্ড

বলো দেখি, কথা নেই বার্তা নেই, বসতের ওপর দিয়ে ট্রাক্টর চলবে। কপিলদাস চিৎকার করে ডাকে তখন, সলিমউদ্দিন, এ সলিমউদ্দিন!

তার ডাক সলিমউদ্দিনের কানে পেঁাছোয় কিনা বোঝা যায় না। অন্ধকারের ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। চারদিকে তার মেলানো সংসার। টাঙনের স্রোত, দক্ষিণের কান্দর, মানুষজন, আসমান, ধানক্ষেত এমন কি নিজের সুখ-দুঃখ কি সাফল্য-ব্যর্থতা পর্যন্ত সে আজকাল একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলানো দেখতে পায়। আর সেজন্য নিজের ছোট্ট দুনিয়ায় সে ভারী নিশ্চিন্ত ছিলো। কেমন ধারণা হয়েছিলো জীবন এরকমই বয়ে যায়। একটুখানি ঝগড়া বিবাদ, হৈ চৈ, কিছু দুঃখ, খানিক সুখ, জনম-মরণ সব মিলিয়েই জীবন। সে ভেবে নিয়েছিলো এই ভাবেই দুনিয়া তার নিয়ম পালন করে। কিন্তু সলিমউদ্দিন এ কোন কথা বললো? কথাটা তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগলো।

তবে হলে কি হবে আসলেই সে বুড়ো মানুষ তো। মন একদিক থেকে আরেকদিকে চলে যায়। কয়েক পা এগোতে না এগোতে ওপরের দিকে নজর তুললে আসমানের তারা দেখতে পায় সে আর তাই দেখতে পেয়ে সে আসমানের শোভা দেখে কিছুক্ষণ। চোখ ঝাপসা, কিন্তু দেখতে পায় ঠিকই—শীতের আসমানে ঝকঝক করছে নীল নীল তারা। তারা কি আসলেই নীল? নাকি তার অমনি হঠাৎ মনে হলো। সে ঠিক ধরতে পারে না। একটা তারা তার খুব চেনা মনে হলো। ঐ তারাটাই না?

ঐ রকম দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই সে পুরনো কথার মধ্যে চলে যায়। নরোম কোলের ওপর ছিলো মাথাটা। মুখের ওপর সিনথিয়ার স্তনভার। সিনথিয়া সোজা হয়ে বসায় বুকের আড়াল সরে যায় আর তখন তারাটা চোখে পড়েছিলো। একটা ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠেছিলো সে। সিনথিয়া কানের কাছে ফিস ফিস করছিলো, চল পালাই।

পালাবো, সিনথিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলো কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিলো, না। পষ্ট করে জোরের সঙ্গে বলেছিলো, না।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপিলদাস মাথা নাড়ায়। আর নিজেকে শোনায়—না, ক্যানে পালাবো। তার পা আপনা থেকে বাড়ীর পথ ধরে। কোথায় পালাবে সে। এক সময় আবার হাসি পায় বুড়োর,

পালাবার কথাটা এলো কোথেকে ? তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল—নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তখন সে বলে, তোর কিছু ফম থাকে না। আর ঐ সময় ট্রাকটরের আওয়াজটা তার কানে এসে ধাক্কা মারে। কী কারণে যে হঠাৎ ধকধক শব্দ করে জেগে উঠলো ঘুমন্ত ট্রাকটরটা আন্দাজ করা মুশকিল। বিনোদ মিস্ত্রি একেকদিন এই রকম হঠাৎ ট্রাকটরের এঞ্জিন চালিয়ে দেয়। ট্রাকটরটা সে চোখের সামনে দেখতে পায় যেন। বিশাল বিশাল দুই চাকা ঘুরতে ঘুরতে মাঠের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে, পেছনের ধারালো চাকতিগুলো মাটি ফালা ফালা করে দিচ্ছে, গন্ধ বেরুচ্ছে কাটা মাটির ভেতর থেকে। ঐভাবে ট্রাকটরটা চলে আসে একেবারে দীনেশ কিস্কুর বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত। তারপরই বেশ দিব্যি ঘুরে যায়। বসতই হলো ট্রাকটর চলাফেরা করার শেষ সীমানা। হ্যাঁ, কলের জিনিস ঐ পর্যন্ত আসে। সংসারের সীমানা পর্যন্তই তার আসবার ক্ষমতা, তারপর আর পারে না, এতোকাল অন্ততঃ পারে নি। আর এখন সেই কলের জিনিস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে দীনেশ কিস্কুর উঠোনে। ঘরের দেয়ালে ভোঁতা নাক ঢুকিয়ে উল্টো দিকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরুবে। দৃশ্যটাকে সে মনের ভেতর দেখতে পায়। আর তাই দেখে সে ভয়ানক অস্থিরতা বোধ করে। ই কি কথা আঁ ? ট্রাকটর চলে আসবে সংসারের বুকের ওপর ? সংসারের কাচ্চা বাচ্চা, গাই গরু, সব্জিক্ষেত, সুখ আহলাদ-- সব কিছুর ওপর দিয়ে গড়গড় করে চলে বেড়াবে – ই কেমন কথা, ম্যানেজার মহাজন ওরকম হুকুম কেমন করে দেয় ?

সলিমউদ্দিনের কথাগুলো এবার একের পর এক মনের ভেতরে স্পষ্ট হতে থাকে। সিলভীর দা নিয়ে বিন্দা মাঝির দিকে তেড়ে যাবার ঘটনা, সোনামুখী আর মহাজনের ঢলাঢলি—ওদিকে নগেন দাস কি একটা চিঠি লিখেছিলো না কোথায় ? ব্যাপারটা নিয়ে না কিছুদিন ধরেই টানাহেঁচড়া চলে আসছে ?

কপিলদাস বুড়োর এখন মনে পড়তে থাকে। এই বস্তি উঠে যাবার ব্যাপারটা আকস্মিক নয় একেবারে—তাহলেও, এই কি শেষ পর্যন্ত পরিণতি ? বস্তি টস্তি উঠে যাবে আর ট্রাকটর চলতে থাকবে ঘরবাড়ি-ভিটেমাটির উপর দিয়ে। কোথায় একটা মেয়েমানুষের মাথা গরম করে মাতালের দিকে দা উঁচিয়ে তেড়ে যাবার ঘটনা আর কোথায় বাড়ীঘর সংসারশুদ্ধু লোপাট করে দেওয়া।

কিসের সঙ্গে কিসের জড়ানো। কিন্তু ভাবো তো বসতটা কতো পুরনো? মনে আছে তোর, হাঁ বাহে মড়লের ব্যাটা, তোর কি ফম আছে?

হাঁ হাঁ ফম আছে। বিচার বসেছিলো ফার্মের অফিস ঘরে। কে একজন সাহেব মানুষ শুধোচ্ছিলো। আর সে উত্তর দিচ্ছিলো। কবে কোন প্রাচীনকালে এসেছিলো একদল মানুষ। সেই দলের মড়ল ছিলো শিবোনাথ। শিবোনাথ আবার গুণিন ছিলো। কিন্তুক গুণিন হলেই কি সব হয়, অাঁ? হয় কখনও? হয় না।

ঐ পর্যন্ত বলার পর আর বলতে পারে নি সে—মহিন্দর ধমকে উঠেছিলো। পরে জানিয়েছিলো, তুই আর হামার সঙ্গে আসিস না বাপ – তোর কথার কুনো ঠিক নাই। কুন কথাত তুই কুন কথা কহিস বুঝিস না।

হাঁ মড়ল তুই বুঢ়া মানুষ—তুই কিছু করিবা পারিস না। ঐ দিনই কে যেন বলেছিলো কথাটা। কপিলদাস কথাটা নিজেকে শোনালো আরেকবার

তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছু করার নাই। একবার নয়, ঘুরে ঘুরে কথাটা সে বলেই চললো। আর থেকে থেকে ভারী গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়লো কয়টা। আর ঐ দীর্ঘশ্বাস তাকে বার্ধক্যের অক্ষমতা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে তার দেরী হয়ে যায়। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় পা দু'খানি অসাড় হয়ে উঠেছে। উঠোনের আগুনের কাছে বসে বসে সে হাত পা সেঁকে কিছুক্ষণ। মহিন্দর আর দীনদাসের ছেলে এক সঙ্গে বসে পাথরে ঘষে ঘষে তীরের ফলায় শান দিচ্ছে দেখতে পায়। বোধহয় আগামীকালের আয়োজন। ওদিকে বিন্দা মাঝির মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। কাকে যেন গালাগাল করে চলেছে বুড়ি। বয়স্ক পুরুষদের কাউকে দেখছে না সে—গেলো কোথায় সব? কথাটা একবার জিজ্ঞেসও করে সে। কিন্তু কেউ জবাব দেয় না। মহিন্দরের বউ বিন্নী থালায় করে ভাত দিয়ে যায়। আগুনের তাতে ততক্ষণে আরাম লাগছে কপিলদাসের। ভাতের পাশে একটুকরো পোড়া মাংস দেখতে পেয়ে সে খুশি হয়। নাতিদের শুধোয় কি শিকার পেয়েছিলো তারা। মহিন্দরের ছেলে শিকারের গল্পটা আরম্ভ করে বোধহয়—কিন্তু তার গল্পের দিকে বুড়ো আর মনোযোগ দিতে পারে না। মাড়ি দিয়ে ধরে মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্বাদ এবং গন্ধে আন্দাজ করে নেয় ডাহুকের মাংস চিবোচ্ছে সে। নাতিদের দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা করে কার কাজ এটা শিকারে কার হাত

ভালো। কিন্তু ঐ অনুমানের চেষ্টাও থাকে না একটু পর। বিন্নীকে ডেকে মহিন্দরের খোঁজ করে। কিন্তু উত্তর আসে না। রাগ হবার কথা—কিন্তু রাগে না সে। এসব তার নিত্যিকার অভ্যেসের মধ্যেই পড়ে। বরং সে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। মাংসটা চিবুনো শেষ হলে আরেকবার থালার ভাত নাড়াচাড়া করে। খোঁজে, যদি আরেকটু মাংস পাওয়া যায়, মাংস না পেয়ে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। শুধু শুধু ভাত মুখে উঠতে চায় না।

দাদা বড় জঙ্গলত্ নাকি বাঘ থাকে?

নাতির প্রশ্ন শুনে একটু সজাগ হতে হয় বুড়োকে। ঠিক মনে করতে পারে না। প্রাণনগরের জঙ্গলে কি বাঘ আছে? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে। তারপর মাথা নাড়ায়, নাই রে—শুকদাস, ঐঠে বাঘটাগ নাই। কিন্তুক ছিল এক সময়।

নাতিরা ঘন হয়ে বসে। কপিলদাস ভাত খাওয়ার কথা ভুলে যায় তখন। সে গল্প আরম্ভ করে।

গল্প মানে তো নিজের কথা। সাঁওতাল কিশোর ছেলের যে ব্যাপারে সবচাইতে আকর্ষণ সেটাই সে ধীর স্বরে বর্ণনা করতে থাকে। তার কালো রঙের কুকুরটার কথা আসে। তার ঘরে খুঁজলে তীরের চোঙ্গা দু'টো এখনো পাওয়া যাবে—সেই চোঙ্গার ভেতরে বাছা বাছা তীর জমানো থাকতো। একবার তীর দিয়ে একটা বাঘ গেঁথে ফেলেছিলো। ভাগ্যিস সে তখনো বাঘ কি জিনিস জানতো না। বনবিড়াল ভেবে নিশানা করে তীর ছেড়ে দিয়েছে আর অমনি কি ডাক। ভয় পেয়ে পড়িমরি করে কী রকম দৌড়েছিলো সেই ঘটনাটা সে বলে এবং বলবার সময় দৌড়ের বর্ণনাটাই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। বুড়োমানুষের গুনগুন গুনগুন ধীর স্বরের একঘেঁয়েমিতে বিরক্তি লাগে বাচ্চাদের। শুকদাস অস্থির হয়ে ডাকে, দাদা বাঘটার কি হইল্‌?

ও, হাঁ, বাঘটা। কপিলদাসকে একটু ভেবে নিতে হয়। তীর খেয়ে বিকট চিৎকার করে উঠবার পর বাঘটার যে কি হয়েছিলো কোনোভাবেই মনে পড়তে চায় না। তখন গল্পটা সে বানাতে আরম্ভ করে। তার বর্ণনায় তখন কৌতুক আসে। বাঘের ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবার ব্যাপারটা সে রঙ চড়িয়ে বলতে চায়। কিন্তু বাঘটা টেনে নিয়ে আসবার সময় কি রকম কষ্ট হচ্ছিলো সে কথাটাই ঘুরে ফিরে বলতে থাকে সে।

শীতের রাত, ততক্ষণে সবারই ঘরে গিয়ে শোবার কথা। কিন্তু কেউ শুতে যাচ্ছে না সেটা সে লক্ষ্য করে। দেখে, ইতিমধ্যে মহিন্দর, দীনদাস এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে কোনো শলাপরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা যে কি, কিছুই অনুমান করা যায় না।

ও হ্যাঁ, বাঘটার যেন কি হয়েছিলো? কপিলদাস কিশোর দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাজ ধরে টানবার প্রসঙ্গে ফিরে আসে। ঐ রকম যখন টেনে আনছিলো তখনো কিন্তু বাঘটা বেঁচে ছিলো—হ্যাঁ। ঘা খাওয়া বাঘ কিন্তু ভয়ঙ্কর জিনিস।

এই পর্যন্ত বলে থামতে হয়। ঘা খাওয়া বাঘের ভয়ঙ্করতা কী ভাবে বোঝাবে সেজন্যে তাকে ভাবতে হয়। আর ঐ সময় মহিন্দরদের কাছে একটি লোককে আসতে দেখে সে গল্পের কথা ভুলে যায়। উঠে গিয়ে দাঁড়ায় মহিন্দর আর দীনদাসের কাছে।

ম্যানেজার মহাজনের কথা হচ্ছে তখন সেখানে। ভায়া মাঝি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলো, কী রকম ধমক খেয়েছে সেই কথা বর্ণনা করছে সে। বলছে ম্যানেজার মহাজন চিনিকল এলাকা থেকে লোক জোটানোর জন্যে বিন্দা মাঝিকে টাকা দিয়েছে। যাতে গোলমাল না হয় সে জন্যে থানায় পর্যন্ত লোক চলে গিয়েছে।

তাহলে? চাপা, ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কগ্রস্ত স্বর বার হয় সবার মুখ দিয়ে। তাহলে কী হবে এখন। দুশ্চিন্তাটা সবার মনের ওপর ভারী হয়ে ওঠে। কথা সরে না কারো মুখে।

এতোগুলো লোক দাঁড়িয়ে, কিন্তু কথা বলছে না কেউ। কপিলদাস কেমন অস্থির বোধ করে। চারদিকে অন্ধকার, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে আর মানুষ ক'জনা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কী যে কাণ্ড ঘটে সব। কপিলদাসের খারাপ লাগতে আরম্ভ করে। সে উসখুস করতে থাকে। শেষে এক সময় বলেই ফেলে—মাহাজন বগত উঠায় দিবা চাহিলেই কি হোবে, ক্যানে হামার কমরত্‌ জোর নাই?

উত্তেজনায় কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাকে থামতে হয়। থেমে অপেক্ষা করতে হয় কথাটার কোনো প্রতিক্রিয়া

হচ্ছে কি না দেখার জন্যে। ওদিকে মানুষ ক'জনা নড়ে না, চড়ে না, আন্দোলিত হয় না। মূর্তির মতোন চপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কপিলদাসের রাগ হয় তখন। বেশ গলা চড়িয়ে বলতে থাকে আবার—ক্যানে, হামার কমরত্ জোর নাই—আঁ? এ মহিন্দর, হামার কমরত্ কি জোর নাই? দীনদাস তুই কহ, জোর নাই হামার কমরত্?

মানুষ ক'জনা অন্য কথা ভাবছিলো তখন। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া কি রকম ভয়ানক ব্যাপার সেই দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিলো সবার। কি উপায়ে ম্যানেজার মহাজনকে শাস্ত করবে সেই কথা ভাবছিলো তারা। আর ঠিক ঐ সময়ে কপিলদাসের ঐ রকম পাগলামির কথা শুনে কে একজন রেগে ওঠে। বলে তুই যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষের ইসবের ভিতর থাকবার দরকার নাই।

কপিলদাস ঠিক করতে পারে না কথাটা কে বললো। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায়না। তবে কথাটা তাকে রাগিয়ে দিলো। সে গাল দিয়ে উঠতে চাইলো। বললো, ক্যানে বুঢ়া হইলে কি মোর কুনো দাম নাই আঁ? বুঢ়া হইলে কি মানুষের দাম থাকে না, কহ?

নিজের ছেলে মহিন্দরও বিরক্ত হয়—বলে, তুই এখুন যা তো বাবা, বুঢ়া মানুষ তুই ইসবের কি বুঝিস।

কপিলদাস বুড়ো এবার সত্যিই দমে যায়। নিজের জন্ম দেয়া ছেলে যদি এই রকম করে বলে তো সে কি করবে। তাকে পিছিয়ে আসতে হয়। হা মড়ল, তুই তো বুঢ়া মানুষ, তুই কিছু করিবা পারিস না। কথাটা ঘুরে ফিরে কেউ যেন তার কানের কাছে বারবার করে বলতে থাকে। সে কিছুই করতে পারে না, তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে মানুষের জটলাটা দেখে। ততক্ষণে জায়গাটা বেশ একটুখানি সমাবেশ মতো হয়ে উঠেছে। দেখে, দীনদাস হাত নেড়ে নেড়ে কি বলে চলেছে। তারপর আবার মহিন্দর আরম্ভ করলো। তার কথা শেষ হতে না হতেই ওদিক থেকে আবার ভায়া মাঝি আরম্ভ করে দেয়।

ভারী ধীর নোয়ানো স্বর। শান্তভাবে পরামর্শ হচ্ছে যেন। রাগ নেই। জ্বালা নেই। কারো দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠছে না, কেউ চিৎকার করে গালাগাল দিচ্ছে না। কপিলদাসের ভারী অবাক লাগে গোটা

ব্যাপারটা দেখে। অবাক লাগে, কিন্তু কিছু বলে না সে। বরং নিজেকে সরিয়ে আনে। কয়েক পা পিছিয়ে আসে সে। কিন্তু ঐ কয়েক পা সরে আসতে অনেকটা সময় লেগে যায় তার। কানের কাছে তখনও সে শুনছে —তুই বুঢ়া মানুষ হে মড়ল, তোর কিছুই করার নাই। যেখান থেকে উঠে এসেছিলো সেইখানে সে ফিরে যায়। শুধুই যথাস্থানে ফিরে যাওয়া, শুধুই মেনে নেওয়া— তার কেবলই মনে হতে থাকে।

বাচচারা লোক সমাগম দেখেই সম্ভবতঃ উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। মেয়ে বউরা এখানে সেখানে ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে। বাচচারা একত্র হলে যা হয়—ততক্ষণে খুনসুটি, দাপাদাপি এবং হাসাহাসি এইসব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পাথরের ওপর ঘষে ঘষে তীরে শান দেওয়া তখনো হচ্ছে। মহিন্দরের ছেলে ডাকলো, দাদা তারপর বাঘটার কি হইল্ ?

ও, সেই গল্প। কপিলদাসের মনে পড়ে একটু আগে শিকারের গল্প বলতে বলতে সে উঠে গিয়েছিলো। তখন আগুনের আলো কিশোর মুখের ওপর চমকাচ্ছে, কে একজন কঞ্চি দিয়ে আগুনটা আরেকটুখানি উস্‌কে দিলো। আর ঐ ঘটনার কারণেই কি না কে জানে, কপিলদাস গল্পটা আবার আরম্ভ করে দিলো। হ্যাঁ, বাঘটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে আসছিলো সে। ভারী ওজন হয় বাঘের। আর বাঘটা ওদিক তখনও কিন্তু মরে নি। নাহ্, বাঘটা বোধহয় মরেই গিয়েছিলো! হঠাৎ তার মনে পড়ে।

কপিলদাস সৎ হয়ে উঠতে চায় বাচচাদের কাছে। গল্প বানানো বাদ দেয়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে তখন। বাঘটার গায়ে বিকট গন্ধ ছিলো, তীরটা ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে গেঁথেছিলো, একেবারে এদিক থেকে ওদিক বেরিয়ে গিয়েছিলো। রক্ত তখনও বেরুচ্ছিলো গলগল করে। আর ঐ সময়, বিকেল বেলায়, প্রাণনগরের জঙ্গলের ধারে একটা লোক ছিলো না চারদিকে কোথাও। সে চিৎকার করে বাবাকে ডাকছিলো, বন্ধুদের ডাকছিলো। আর ঠিক তখন হঠাৎ তার পাশের ঝোঁপ থেকে কি একটা জানোয়ার লাফ দিয়ে বেরিয়েই বাঁয়ে ছুটতে শুরু করে দিলো। ঐ জানোয়ারটা দেখেই সে—

এ পর্যন্ত বলেই সে থামে। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে ইতস্ততঃ করে। আহা কেমন করে বলবে যে শেয়াল দেখে সে ভয়ানক ভয় পেয়ে পালিয়েছিলো।

তারপর, তারপর কি হইল ? বাচ্চারা সমস্বরে জিজ্ঞেস করলে সে হঠাৎ হেসে ওঠে। হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, কিসের বাঘ, চেৎ বাঘ ? উতো গিধর কানা। শেয়াল, নেহাতই শেয়াল। বাচ্চারাও হাত তালি দিয়ে হেসে ওঠে। সম্ভবতঃ কপিলদাসের বলবার ভঙ্গীতে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। বাচ্চারা মহা উৎসাহে কথা বলতে আরম্ভ করে, তুই বাজপাখি মারিছিস দাদা, বাজপাখি ? ভালুক মারিছিস তুই, এ দাদা, হরিয়াল মারিস নাই, হরিয়াল ? সম্মিলিত উপর্যুপরি প্রশ্ন হতে থাকে। আর কপিলদাসেরও যে কী হয় সেও ভারী হাল্‌কা হয়ে ওঠে—মজার মজার কথা বেরুতে থাকে তার মুখ দিয়ে। আরে তুই কে রে—তুই না ভায়া নাঝির ব্যাটা। হাঁ, তুই হলো চিলহা, বুঝলো। আর তুই ? তুই হলো বাগদোর, তুই কে জানিস ? তোর নাম গক্রম। অহো তুই ঐঠে ক্যানে—তুই তো ভাল্লুক মামা।

ছোট বাচ্চারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কপিলদাস তখন নিজের আলাদা অস্তিত্ব আর অনুভব করতে পারে না। তীরে শান দেবার সময় কি রকম করে পাথরের ওপর ঘষতে হয়—তাই দেখায়। একজনের হাত থেকে বাঁশিটা টেনে নিয়ে ফুঁ দেয়, ফুঁ দিয়ে একটা বহু পুরনো সুর বাজায়। কি বাজালো অ্যাঁ, কি বাজালো দাদা ? প্রশ্ন হলে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় গানটা গায়---

ফকির বুলে ঢুলুক বাজে
ভালুক নাচে ঝাম,
হাইয়ারে হালমাল কই গেলু রে—এ—এ।

গানটি শুনে বাচ্চারাও গাইতে শুরু করে দেয়।

বুড়োর ভীমরতি হয়েছে ভেবে মেয়েরা কেউ কেউ মনোযোগ দেয় বাচ্চাদের জটলার দিকে। বড়রা যেখানে সভা বসিয়েছে সেখান থেকেও কে একজন চিৎকার করে গোলমাল বন্ধ করতে বলে। কিন্তু বাচ্চাদের থামাবে কে ? মহিন্দরের ছেলে ধনুকের জন্যে বাঁশের ছিলা তৈরিতে ব্যস্ত ছিলো। কপিলদাস তার হাত থেকে কেড়ে নিলো ধনুকটা। বললো, দেখ, কেমন করে ছিলা পরাতে হয় ধনুকে।

বাচ্চারা তখন ঘিরে দাঁড়ায় বুড়োর চারদিকে। কপিলদাস হাঁটু ভেঙ্গে ধনুকের এক মাথা ধরে ঝুলে প'ড়ে ধনুকটা নোয়ায়। তারপর বাঁ হাতে ছিলার ফাঁসটা ধনুকের মাথায় ঢোকাতে চায়। কিন্তু প্রথমবারেই পারে না।

ডান হাতটা তার ভীষণভাবে কাপতে থাকে। বাচ্চারা বুড়োর কাণ্ড দেখে সমস্বরে বলে, পরবো নাই দাদা—তুই পারবো নাই। কিন্তু পারে সে। ঐ কাঁপা কাঁপা হাতেই সে ছিলা পরিয়ে দেয় ধনুকের। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলা টেনে ধনুকের একটা টঙ্কার তোলে। ভারী সুন্দর টানটান আওয়াজ হয় তাতে। এর পরও বুড়ো থামে না। একটা শানানো তীর নেয় হাতে এবং তীরটা ধনুকের ছিলায় বসিয়ে তাক করে। সামনের দিকে একবার, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। বুড়ো ভয় দেখিয়ে মস্করা করে যেন। বাচ্চারা তাতে হৈ হৈ করে উঠে। আর ঐ রকম হৈ হৈ শুনেই সম্ভবতঃ কপিলদাস তীরটা দু'আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে ছিলা ধরে টানে। টেনে ধনুকের নিশানা করে অন্ধকারের দিকে। মহিন্দরের ছেলে বলে ওঠে, দাদা তীরটা ছুটে যাবে, দাদা মোর তীরটা ছুটে যাবে। কিন্তু কপিলদাস নাতির মিনতি শুনতে পায় কি না বোঝা যায় না। সে সত্যি সত্যি তীরটা ছেড়ে দেয়। আর বাতাস কাটা শব্দ করে তীরটা অন্ধকারের দিকে ছুটে যায়।

চারদিকে মানুষের বসত। মেয়েরা বুড়োর কাণ্ড লক্ষ্য করে হাঁ হাঁ করে ওঠে। সভার মানুষদের মধ্য থেকেও কয়েকজন এগিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বুড়ো কপিলদাস আর একটা তীর হাতে তুলে নিয়েছে। সবাই যখন নিষেধ করছে তখন সে দ্বিতীয় তীরটাও সামনের অন্ধকারের দিকে নিশানা করে ছুঁড়ে দিয়েছে। এবং ঐ কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় ব্যাপারটা আর ছেলেমানুষী তামাসার পর্যায়ে থাকে না। দূর থেকে মহিন্দর চিৎকার করে ওঠে, বিশ্রী গালাগাল করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বুড়ো তখন হাসছে কেমন দেখো, যেন সে কিশোরকালে ফিরে গিয়েছে। জীবনে প্রথম নিশানা ভেদ করার যে খুশি---সেই খুশি পেয়ে বসেছে তাকে। সে শান দেয়া আরো একখানা তীর হাতে তুলে নিয়েছে তখন। ওদিকে পেছন থেকে দীনদাস চিৎকার করে বলছে---ধর বুঢ়াটাকে, ধরে কাঢ়ে লে ধেনুকখান ---সেই চিৎকার বুড়োর কানে আদৌ পৌছায় না। কেউ পেছনে তাকে ধরতে আসছে কিনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কপিলদাস বুড়ো দু'হাতে তীর ধনুক নিয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে চলতে থাকে। বিমূঢ় মানুষজনের চোখের সামনে দিয়েই সে অনায়াসে অন্ধকার, গাছপালা কৈশোর এবং আদিম উল্লাসের মধ্যে চলে যায়। আর সেখান থেকে সে তার তৃতীয় তীরটা সঠিক নিশানায় ছুঁড়বার জন্যে তৈরি হতে থাকে।

ভাঙাচোরা মধ্যবিত্তের অভিযোগ ও বিলাপে নুয়ে পড়া সাম্প্রতিক বাঙলা কথাসাহিত্যের রুগ্ন প্রেক্ষাপটে শওকত আলীর গল্প সম্পূর্ণ নূতন ও স্বতন্ত্র। তাঁর কন্ঠ অভিমানে ভেঙে পড়েনি, এই কন্ঠ মানুষের পরাজয়ের কথা জানাবার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে না। শওকত আলীর গল্পে ধ্বনিত হয় শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সশব্দ প্রতিবাদ। মধ্যবিত্তের রুদ্ধশ্বাস গৃহে এই প্রতিবাদ বেজে উঠছে ঝন ঝন করে, খুলে পড়ছে মরচে পড়া ঘুণে ধরা দরজা জানালা, ঠা ঠা রোদে তেতে উঠছে সাম্প্রতিক সাহিত্যের স্যাঁতসেঁতে ঘরবাড়ি। অলঙ্কারবর্জিত ও স্পষ্ট এই সব গল্প যুগযুগান্তের শোষিত কোটি কোটি মানুষের ঋজু মেরুদন্ডকে অভিনন্দন জানায়, সমস্ত জনপদ বনভূমি কান্দর কাঁপিয়ে ঘোষণা করে তাদের দৃপ্ত প্রতিরোধের কথা।